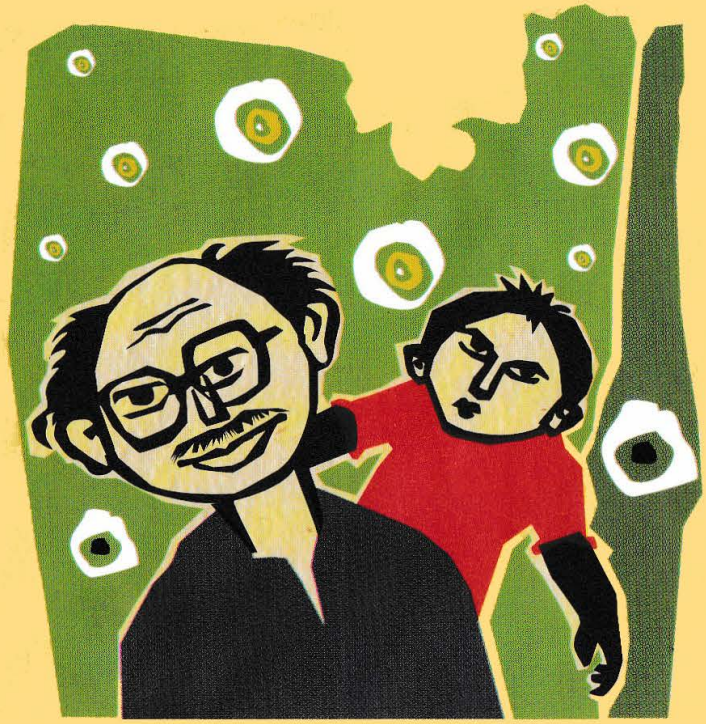

ছোটদের নিয়ে বিভিন্ন মেজাজের কিছু গল্প নিয়ে এই বই। ছোটদের জন্য কিছু লেখা সবচে কঠিন কাজ বলে মনে করেন আহসান হাবীব। তারপরও বই মেলা এলেই এই কঠিন কাজটা করতে ইচ্ছে করে। সেই ইচ্ছের ফসল এই গ্রন্থ 'অজিত স্যারের সূত্র'।

প্রচ্ছদ

মোস্তাফিজ কারিগর

অজিত স্যারের সূত্র

আহসান হাবীব

তাম্রলিপি

অজিত স্যারের সূত্র
আহসান হাবীব

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তাম্রলিপি-২৫৩

পরিচালক
তাসনোভা আদিবা সেঁজুতি

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি
৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

কম্পোজ
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
এম.আর প্রিন্টিং প্রেস
১১ প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ১৩৫.০০

Ozit Sirer Sutro
by : Ahsan Habib
First published February 2014, by A K M Tariqul Islam Roni
Director : Tasnova Adiba Shanjute, Tamralipi, 38/2ka, Banglabazar, Dh

উৎসর্গ -

ধ্রুব এষ
আমার প্রিয় এক শিল্পী...

ভূমিকা

বাচ্চাদের নিয়ে গল্প লিখতে গিয়ে নিজের বাচ্চা বেলাটা মনে পড়ে যায়। ইচ্ছে হয় টাইম মেশিনে চড়ে যদি সত্যি সত্যি পেছনে গিয়ে নিজের কৈশোর কালে আবার হাজির হওয়া যেত, তাহলে সেই ছেলেবেলার দুষ্টুমিগুলো আরো একটু বেশি বেশি করে আসা যেত। সত্যি বড্ড দেরি হয়ে গেছে।

সেই রকম কিছু গল্প নিয়ে এই বই। কিশোর বন্ধুদের ভালো লাগবে কি না, জানি না। তবে আমার লিখতে গিয়ে কিন্তু বেশ ভালোই লেগেছে।

আহসান হাবীব
উন্মাদ কার্যালয়
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।

সূচিপত্র

মামা-ভাগ্নে না ভাগ্নে-মামা?	১১
অজিত স্যারের সূত্র	১৬
বিজ্ঞান স্যার	২৪
রোজগার	২৭
মন্টুর মামা	৩১
ভালো ছেলে	৩৩
রায়হানের সমস্যা	৩৬
ফেলটুস	৩৯
কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে	৪৩
এ যুগের জোলা-জুলি	৪৭
সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষ	৫২
কাইযেন	৫৭
পর্বত প্রতিবাদ	৬২

মামা-ভাগ্নে না
ভাগ্নে-মামা?

কথায় বলে মামা-ভাগ্নে যেখানে, বিপদ নাই সেখানে। কিন্তু কথাটা রন্টুর বেলায় পুরাই উল্টো তার ছোট মামা মানে সনজু মামার কথাই ধরা যাক, তিনি যতবার তাকে নিয়ে কোথাও গিয়েছেন, মানে উল্টো করে বললে রন্টুর সঙ্গে যতবার মামা কোথাও গিয়েছেন, ততবারই একটা না একটা গ্যাঞ্জাম, মানে বিপদ হয়েছেই। যেমন এই তো মাসখানেক আগে সনজু মামা এসে বলল–

এই রন্টু ওঠ

কেন?

দেখছিস না আমার হাতে কী?

কী?

গাধার গাধা বড়শিও চিনিস না? এটা দিয়ে মাছ ধরে। চট করে তৈরি হয়ে নে। মাছ শিকারে যাব।

দেখ মামা। রন্টু গম্ভীর হয়ে বলার চেষ্টা করে। 'শিকার করাটা অপরাধ, যারা পাখি বা বাঘ শিকার করে... '

তবে না শেষ পর্যন্ত সনজু মামার সাথে মাছ শিকারে... থুক্কু, শিকার না, মাছ ধরতে রওনা হলো। রিকশা, সিএনজি, বাস ঠেলে মামা হাজির হলো এক পুকুরের পাড়ে। গেট টপকে একটা বিশাল পুকুর। জায়গাটার নাম এখন আর মনে পড়ছে না।

তবে জায়গাটা বেশ পছন্দ হলো রন্টুর। সনজু মামা বড়শিতে কেঁচো বিঁধিয়ে ফেলল পানিতে। এবার অপেক্ষার পালা। মামা বলল,

'ফরমালিন দেওয়া মাছ খেতে খেতে তো পেটটাকে নষ্ট করছিস তোরা। আজ পুকুরের তাজা মাছ নিয়ে খেয়ে দেখ কেমন লাগে।'

রন্টু বুদ্ধি করে একটা কমিকসের বই নিয়ে এসেছিল। সেটাই খুলে বসল আর পাশে বসে বক বক করছিল সনজু মামা। আর তখনই একটা লোক এল হাতে শিকল দিয়ে বাঁধা ভয়ংকর এক কুকুর।

এই, তোমরা কারা?

ইয়ে আ-আমরা আরকি... মামার কথা আটকে যায় গলায়।

এখানে কী হচ্ছে?

দেখতেই পাচ্ছেন... মা...

মাছ ধরতে আমার পুকুরে? ফাজলামো পেয়েছ? নোটিশ বোর্ড দেখনি?

না না তা কেন? মানে...মানে...

মানে মানে করছ কেন? বড়শি পুকুরে ফেলেছ কেন? হোয়াই???

হে হে মানে হয়েছে কী আমাদের রন্টুর আবার কিছু পালা কেঁচো আছে সেগুলোর গোসল দিচ্ছি ... তাই না রে, রন্টু?

মামা রন্টুর দিকে তাকান সম্মতির আশায়। রন্টুর চোখ তখন কুকুরটার দিকে। আর কী আশ্চর্য লোকটা হঠাৎ আলগোছে কুকুরের শিকলটা ছেড়ে দিল আর কুকুরটাও তেড়ে গেল মামার দিকে। মামা একটা ডিগবাজি দিয়ে ঝপাং মানে সটান পুকুরে আর রন্টু এক ছুটে গেটের বাইরে।

সেই থেকে রন্টু আর কখনো সনজু মামার সাথে কোথাও যায় না।

কিন্তু রন্টু ভাবে এক, হয় আরেক। ফের একদিন সনজু মামা এসে হাজির সেই দিনের মতো, সেম টাইম সেম ডায়লগ... সনজু শুয়েছিল মামা বলল

এই রন্টু ওঠ তো

কেন?

দেখছিস না আমার হাতে কী?

কী?

গাধার গাধা এয়ারগানও চিনিস না। এটা দিয়ে পাখি পারে তৈরি হয়ে নে। পাখি শিকারে যাব।

দেখ মামা। রন্টু গম্ভীর হয়ে বলার চেষ্টা করে। 'শিকার করাটা অপরাধ, যারা পাখি বা বাঘ শিকার করে... তারা... '

গাধার গাধা আমি পাখি শিকারে যাচ্ছি না

তাহলে?

আমি যাচ্ছি কাক শিকারে

কাক কি পাখি না?

অবশ্যই পাখি এবং অনেক উপকারী পাখি। আর সত্যি কথা বলতে কী, আমি আসলে কাক শিকারেও যাচ্ছি না। আমি যাচ্ছি... মামা ব্যাখ্যা করেন বিষয়টা।

বিষয়টা হচ্ছে মামার মোবাইলটা হারানো গিয়েছিল পরে সেটা পাওয়া যায়, বাসার পেছনের একটা গাছে একটা কাকের বাসায়। তখনই মামার মাথায় আইডিয়াটা আসে। সব কাকের বাসায় সার্চ করা হবে। সার্চ করার সময় যদি কাককুল দলদ্ধভাবে আক্রমণ করে, তাই এই এয়ারগান।

না, আমরা কোনো কাককে মারব না। ভয় দেখাব।

কিন্তু কাকের বাসা সার্চ করার দরকারটা কী?

উফ, তুই বুঝতে পারছিস না বিগ বিজনেস... তুই কি জানিস এক সময় কাকের বাসা ভাঙা একটা পেশা ছিল। মানুষ কাকের বাসা ভেঙে সোনার জিনিসপত্র পেত। আমরাও তাই করব। তবে ওদের ঘর ভাঙব না। শুধু সোনাদানা, মোবাইল এসব দামি জিনিস পেলে তার প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দেব, বিনিময়ে একটা চার্জ নেব। একটা সেবামূলক কর্মকাণ্ড।

- উফ, মামা
- কী হলো?
- মামা, তোমার এই সব উদ্ভট চিন্তা-ভাবনা বাদ দিলে হয় না?
- না, হয় না
- নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমাদের আসতে হবে। কেন মনে নেই বিখ্যাত মনিষী ফ্রান্সিস বেকন কী বলেছিলেন?
- কী বলেছিলেন?

- এ্যাঁ ইয়ে বাদ দে পরে বলব। এখন চল

শেষ পর্যন্ত রন্টুকে যেতে হয় সনজু মামার সাথে 'দ্য ক্রো নেস্ট হান্টিং মিশনে' (নামটা মামারই দেয়া) সারা দিনে তারা মাত্র তিনটা কাকের বাসার সন্ধান পেল তার মধ্যে একটা আবার পরিত্যক্ত বাসা। মানে কাক সেটা সম্ভবত অ্যাবানডেন্ট ঘোষণা করে চলে গেছে অন্য কোথাও। অন্য দুটোর একটাতে পাওয়া গেল কিছু গুনা তার। আরেকটিতে পাওয়া গেল একটা প্লাস্টিকের চিরুনি।
সনজু মামা চিরুনি পেয়ে উত্তেজিত হয়ে গেলেন।
- দেখলি? দেখলি?? তোকে বলেছিলাম না, পাবই পাব।
- এটা একটা সামান্য প্লাস্টিকের চিরুনি। এটা পেয়ে লাভ কী?
- আহ, এটা দিয়েই শুরু... এরপর দেখবি...।

দ্বিতীয় দিনে 'দ্য ক্রো নেস্ট হান্টিং মিশনে' বের হয়ে হলো বিপত্তি। যে কারণে এই গল্প বলা। বাইনোকুলারে চোখ লাগিয়ে মামা একটা কাঁঠালগাছে একটা কাকের বাসা আবিষ্কার করে ফেলল। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, কাঁঠালগাছটা একটা বাসার ভেতরে। বাসাটা সম্ভবত খুব বড়লোক কারো হবে। বেশ বড় বাসা, চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রন্টু বলল
- মামা বাদ দাও, এই বাসায় হবে না।
কেন, হবে না কেন? একটা ভালো কাজে নেমেছি। দাঁড়া আমি দারোয়ানের সঙ্গে কথা বলি।
মামা বীরদর্পে এগিয়ে গেল।
এবং একটু পরেই মুখ কালো করে ফিরে এল।
- কী হলো মামা?
হারামজাদা দারোয়ানটা ঢুকতে তো দিলই না, উল্টো খারাপ ব্যবহার করল আমার সাথে।
এই সমস্ত বড় বড় বাড়ির দারোয়ানরা সব সময় খারাপ ব্যবহারই করে। রন্টু বলল। 'কী খারাপ ব্যবহার করেছে?'
- বলে কিনা... মামা থেমে যায়।
- কী বলে?
- থাক, শুনে তোর মন খারাপ হবে।

- আমার মন খারাপ হবে কেন? খারাপ কথা বলেছে তোমার সাথে।

- তোর মামাকে কেউ যদি স্ক্রু ঢিলা বলে তোর ভালো লাগবে, বল?

হাসি উঠে যায় রন্টুর বহু কষ্টে হাসিটা গিলে বলে– 'বাদ দাও তো মামা, চলো বাসায় যাই।' রন্টুর কথা যেন মামার কানেই যায় না।

ঠিক আছে, ঢুকতে না দিল ঢুকলাম না। কিন্তু দারোয়ান ব্যাটাকে একটা শিক্ষা দিয়ে যেতে চাই।

- কী শিক্ষা দেবে?

সেটাই ভাবছি। বলে মামা মাথায় টোকা দিতে থাকে। টোকা দিতে দিতেই হঠাৎ তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 'দি আইডিয়া!' সনজু মামা বসা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

- কী আইডিয়া?

- ওর মাথায় কাঁঠাল ভাঙব।

- মানে?

মানে, যে কাঁঠালগাছটায় কাকের বাসাটা আছে ঐ কাঁঠালগাছের কাঁঠাল ওর মাথায় না ভেঙে আমি যাচ্ছি না। তুই দাঁড়া... বলে মামা হন হন করে হেঁটে গেল ঐ বাড়ির গেটের দিকে।

এর পরের কাহিনি আর না বলাই ভালো। মামাকে ঐ বাসা থেকে উদ্ধার করে রন্টুই। ফেরার পথে সনজু মামা কো কো করে বলল–

- ইয়ে... রন্টু তুই কী বলে আমাকে বের করে আনলি বল তো?

- বাদ দাও তো...

- আহ, বাদ দেব কেন, বল না?

- তোমার মন খারাপ হবে

- আহ, বল না

- স্বীকার করেছি...

- কী স্বীকার করেছিস?

- বলেছি ...

- কী বলেছিস?

বলেছি সত্যিই তোমার মাথার কিছু স্ক্রু ঢিলা আছে। ছোট মামা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে তার একমাত্র ভাগ্নের দিকে। আর রন্টু মনে মনে ভাবে বাসায় গিয়ে নিজের মাথার স্ক্রু টাইট দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে সেটা হচ্ছে ... আর কোনো প্রজেক্টে সনজু মামার সাথে সে আর নেই। নেভার।

অজিত স্যারের সূত্র

মডেল গার্লস স্কুলের হেড স্যার মোবাশ্বের আলী দুপুরের দিকে অজিত স্যারকে ডেকে পাঠালেন।

- আমায় ডেকেছেন?

- হ্যাঁ ...অজিত বাবু যান তো নাইনের ইংরেজি ক্লাসটা একটু নেন। রব স্যার আজ একটু ছুটি নিয়েছেন।

- আচ্ছা।

অজিত স্যার বেড়িয়ে যাচ্ছিলেন। হেড স্যার আবার ডাকলেন। আরেকটা ব্যাপার

বলুন

আপনার বিষয় অঙ্ক কিন্তু আপনি নাকি প্রায়ই গল্পগুজব করেন অঙ্ক না করিয়ে?

অজিত স্যার হাসলেন। বয়সে তিনি হেড স্যারের চেয়ে বেশিই হবেন। বলা যায়, হেড স্যারের চেয়ে একটু বেশিই বুড়িয়ে গেছেন।

তা একটু গল্পগুজব করি। অস্বীকার করব না, তবে কথা হচ্ছে কী অঙ্কের প্রয়োজনেই গল্প করি। যেমন ধরুন, ঐ যে বিখ্যাত গণিতবিদ রামানুজনের সেই গল্পটা... সেই যেবার তিনি ইংল্যান্ড গিয়ে...

ঠিক আছে, ঠিক আছে, গিয়ে ক্লাসটা নিন...

অজিত স্যার বের হয়ে গেলেন।

নাইনের ক্লাসে ঢুকতেই নাইনের মেয়েদের সবার মুখ ভাড় হয়ে গেল। তারা ভেবেছিল রব স্যার নেই আজ তারা মজা করে আড্ডা মারবে। কিন্তু অজিত স্যার এসে হাজির।

কী আজ কী ক্লাস তোদের?

ইংরেজি সেকেন্ড পেপার স্যার। মুখ ভাড় করে ডেইজি বলে। সে ক্লাসের ক্যাপ্টেন।

হুম। বেশ তাহলে আজ কিছু ট্রান্সলেশন করা যাক। দেখি তোরা ইংরেজি কেমন শিখেছিস বলে স্যার বোর্ডে চলে গেলেন। ঘষ ঘষ করে লিখলেন 'ডাক্তার আসিবার পরে রোগী মারা গেল'

তোরা এটার ইংরেজি কর দেখি।

স্যার ভুল হয়েছে। হাত তুলল রীনা। সে ফার্স্ট গার্ল

কী ভুল?

স্যার ওটা হবে ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী মারা গেল।

না, আমি বলছি, ডাক্তার আসিবার পরে রোগী মারা গেল এটা লিখ।

সারা ক্লাস একসঙ্গে না না করে উঠল।

না স্যার, এই ট্রান্সলেশন আমরা আগেও করেছি এটা হবে ডাক্তার আসিবার পূর্বেই রোগী মারা গেল। ক্লাসে বেশ হাউকাউ শুরু হয়ে গেল। অজিত সার যেন বেশ মজা পেলেন। তিনি বললেন–

আহা বাবা, আমি জানি তো যে তোরা আগে করেছিস ডাক্তার আসিবার পূর্বে রোগী মারা গেল। এখন বলছি ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা গেল সমস্যা কী? ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা যায় না কখনো?

না স্যার, যায় না। শক্ত মুখে উঠে দাঁড়ায় শর্মি। সবাই শর্মির দিকে তাকায়। শর্মির বাবা এই এলাকার সবচেয়ে নামকরা

ডাক্তার সবাই এক নামে চেনে এবং তিনি বেশ প্রভাবশালী। স্কুলের গভর্নিং বডির একজন মেম্বারও।

অজিত স্যার অবাক হয়ে তাকালেন শর্মির দিকে। অজিত স্যার কখনো রাগেন না। কিন্তু আজ তাঁর ভ্রু কুঁচকে গেল। তিনি শক্ত গলায় বললেন–

এই মেয়ে তোমার নাম কী?

শর্মি

পুরো নাম বলো

জাহানারা নার্গিস শর্মি

স্যার, ও ডা. ওবায়দুল্লাহর মেয়ে। পাশ থেকে আরেকটি মেয়ে বলে। এ সময় হেড স্যারকে দেখা যায় দরজায়। তিনি ক্লাসে ঢুকে বললেন

সমস্যা কী অজিত বাবু?

কোনো সমস্যা না তো।

চেঁচামেচি হচ্ছিল

এই সময় শর্মি বলে বসে ট্রান্সলেশনের বিষয়টা হেড স্যারকে...

বিষয়টা এখানেই শেষ হলে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু বিষয়টা চলে গেল গভর্নিং বডি পর্যন্ত। খুব শীঘ্রই অজিত স্যারের অনুপস্থিতিতে স্কুলের হলরুমে একটা মিটিং ডাকা হলো। দেখা গেল, কমবেশি সবাই অজিত স্যারের ওপর বিরক্ত। অজিত স্যারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ

এক) তিনি ক্লাসে অঙ্ক করানোর চেয়ে গল্প করতে ভালোবাসেন।

দুই) অঙ্কের প্রচলিত নিয়মের বাইরে অদ্ভুত সব নিয়মে তিনি অঙ্ক করান।

তিন) গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে তিনি বাসায় বসে দিন-রাত অঙ্কের গাইড বই লিখেন কিন্তু স্কুলে তাঁকে অঙ্ক করাতে খুব আগ্রহী মনে হয় না।

চার) ক্লাসে দেরি করে আসেন আবার আগে আগে চলে যান।

আশ্চর্য, এসব তো আপনারা কেউ আমাকে আগে বলেননি।

হেড স্যার বলেন অন্য টিচারদের।

কীভাবে বলি স্যার একজন বয়স্ক পুরনো টিচারের বিরুদ্ধে।

তাছাড়া তিনি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা রণদা সাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন...তাই আমরা ঠিক...

কী বলছেন এসব আপনারা? পুরনো কাসুন্দি মেনে আমরা স্কুলের সুনাম নষ্ট করব নাকি ?

ঠিক ঠিক

আরো নানা রকম আলোচনা হলো এবং আলোচনায় একটা বিষয়ই মুখ্য হয়ে উঠল যে তিনি এই এলাকার গর্ব ডা. ওবায়দুল্লাহকে প্রসঙ্গক্রমে অপমান করেছেন... যিনি আগামীতে এমপি ইলেকশন করবেন এবং সবাই নিশ্চিত তিনি জিতে আসবেন এবং তাঁর জেতা মানে এই এলাকার ব্যাপক উন্নয়ন। তাঁকে অপমান? এ তো কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। এর একটা শাস্তি হওয়া দরকার।

এর মধ্যে অজিত স্যার জ্বরে পড়লেন। দুদিন স্কুলে যেতে পারলেন না। তৃতীয় দিনে স্কুলে গিয়ে টিচার্স রুমে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে দপ্তরি মালেক এসে জানাল হেড স্যার তাঁকে চা খেতে ডেকেছেন। অজিত স্যার একটু অবাক হলেন। চা তাঁরা এখানেই খান হেড স্যারের রুমে গিয়ে কখনো খেয়েছেন বলে মনে পড়ে না।

আসেন অজিত বাবু, আসেন... আপনার শরীর নাকি খারাপ?

হ্যাঁ, হঠাৎ একটু জ্বর হলো... মনে হয় ভাইরাল ফ্লু।

এর মধ্যে চা চলে এল সাথে দুটো শিঙ্গাড়া।

চা- শিঙ্গাড়া খেয়ে মুখ খুললেন হেড স্যার। কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন–

অজিত বাবু অনেক দিন তো হলো আপনি আমাদের এখানে কাজ করলেন। আর জানেন তো আমাকে স্কুলের গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে চলতে হয়...

রেজিগনেশন লেটার আর গত মাসের বেতন নিয়ে সন্ধ্যার দিকে ফিরলেন অজিত বাবু। তাঁর চাকরি চলে যাওয়ার কথা কাউকে কিছু বললেন না। শুধু বেতনের খামটা স্ত্রীর হাতে তুলে দিলেন।

একি এবার এত আগে আগে বেতন? স্ত্রী অবাক হলেন।

দিল। অজিত বাবু হাসেন। হাসিটা অবশ্য স্ত্রী রমলার ভালো ঠেকে না।

কী গো তোমার কি আবার জ্বর এল? কপালে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন। ' সে কি এত অনেক জ্বর....

চটজলদি বিছানায় শুইয়ে চাদর টেনে দেওয়া হলো গায়ে। জ্বর একশ চারের মতো। কিছু খাইয়ে একটা প্যারাসিটামল খাইয়ে দেওয়া হলো জোর করে। অবশ্য শোয়া মাত্র তিনি ঘুমিয়ে গেলেন। গভীর ঘুম।

ঘুমিয়ে তিনি অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখলেন। একজন মানুষ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। তার গায়ে সবুজ রঙের আলখাল্লার মতো কিছু পরা। তার মাথায় কোনো চুল নেই। সে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করল–

অজিত বাবু আপনার সূত্রটার কী অবস্থা?

কোন সূত্র?

যেটা নিয়ে আপনি ভাবছেন গত এগার বছর ধরে? আর সবাই ভাবছে আপনি অঙ্কের গাইড বই লিখছেন

হ্যাঁ, সে তো কবেই শেষ হয়েছে

শেষ হয়েছে??

হ্যাঁ

স্যার, আপনার ধারণা ভুল ওটা ভুল সূত্র। ওটা ভুলে যান। কাগজপত্র সব ছিড়ে ফেলুন।

ওটা তো আমি পাঠিয়ে দিয়েছি বিদেশের একটা জার্নালে... এখন ছাপলে হয়। ওরাই বুঝবে ভুল কী শুদ্ধ...

হেড স্যার মোবাশ্বের বসে পেপারটা পড়ছিলেন আর ভাবছিলেন একটু পরেই তাকে ক্লাস নাইনের বাংলা সেকেন্ড পেপার-এর ক্লাস নিতে যেতে হবে। কিন্তু শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে... তাঁর ক্লাসটা কাকে দেওয়া যায়, তখনই দপ্তরি মালেক ঢুকল

স্যার

কতবার বলেছি দরজায় নক করে ঢুকবে। কথা কানে যায় না? গর্দভ কোথাকার।

স্যার, দুজন বিদেশি আপনার লগে দেখা করতে আইছে বিরাট গাড়ি নিয়া আসছে।

বিদেশি? বিদেশি কেন?

ঠিক তখনই দুজন বিদেশি ঢুকলেন তাঁদের সঙ্গে ঢুকলেন একজন বাঙালিও। বাঙালি ভদ্রলোককে দেখে হেড স্যার মোটামুটি একটা লাফ দিলেন বলা যায়, মানে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন আরকি।

- স্যার আপনি??

বিদেশিদের সাথে আসা ভদ্রলোক আর কেউ নন শিক্ষাসচিব ড. সাকলায়েন চৌধুরী।

- হ্যাঁ, উনাদের নিয়ে আসতে হলো। উনারা দুজন ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটন থেকে এসেছেন ড. মিলান আর ড. রবিন উনারা দুজনই অঙ্কের অধ্যাপক। উনারা এসেছেন আপনাদের অঙ্কের শিক্ষক অজিত স্যারের সাথে দেখা করতে। উনাকে খবর দিন।

অজিত স্যারের তো চাকরি নাই। হঠাৎ পাশ থেকে দপ্তরি মালেক হাসি মুখে বলে বসে। হেড স্যারের মুখ শুকিয়ে যায়।

- উনার চাকরি নেই মানে! এসব কী বলছেন?

- ইয়ে না মানে... হেড স্যার তোতলাতে শুরু করেন। হারামজাদা মালেক ভেতরে দাঁড়িয়ে তিনি খেয়াল করেননি। এই সময় অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড স্যার ঢুকলেন পরিস্থিতি সামাল দিতে, তিনি

বাইরে থেকে কিছুটা আঁচ করেছেন পরিস্থিতি। কিন্তু ততক্ষণে মালেক আবার বলে বসল–

- জি স্যার, হেড স্যার আর ডাক্তারসাব মিইলা উনার চাকরি খায়া দিছেন। বলে সে দাঁত বের করে হাসল।

বিদেশি দুজন ইংরেজিতে কিছু বললেন। হেড স্যার ঠিক ধরতে পারলেন না। এরা এত দ্রুত ইংরেজি বলে! ততক্ষণে শিক্ষা সচিব উঠে দাঁড়িয়েছেন। মালেকের দিকে তাকিয়ে বললেন

'তুমি উনার বাসা চেন?'

- জি স্যার, চিনি।

- আমাদের এখনই ওখানে নিয়ে চলো।

ডা. ওবায়দুল্লাহ খবর পেলেন। শহরে শিক্ষা সচিব এসেছেন। সঙ্গে কিছু বিদেশিও আছেন। এবং তাঁরা নাকি সরাসরি অজিত মণ্ডল- এর বাসায় গিয়ে হাজির, মানে কী? তিনি একটু চিন্তিত বোধ করলেন। সাধারণত ঢাকা থেকে গণ্যমান্য কেউ এলে আগে তাঁকে খবর দেওয়া হয়। কারণ এই এলাকার তিনিই অন্যতম বিশিষ্টজন। কিন্তু কেউ তাঁকে একটা ফোন পর্যন্ত করল না! মানে কী? তিনি স্কুলের হেড স্যারকে ফোন করলেন

মোবাশ্বের সাহেব?

জি

খবর কী? কারা নাকি এসেছেন ঢাকা থেকে?

স্যার, সর্বনাশ হইছে।

কিসের সর্বনাশ?

অজিত স্যার তো নোবেল প্রাইজ পাওয়ার জন্য নমিনেটেড।

কী বলছেন এসব?

ঠিকই বলছি। তিনি নাকি এমন এক সূত্র বের করেছেন, যা দিয়ে ফিজিক্সের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাচ্ছে...

তাই বলে নোবেলের জন্য নমিনেটেড??

জি জি প্রফেসর ইউনূসের পর উনিই... বিদেশিরা সব আসছেন এই খবর দিতে। সাথে শিক্ষাসচিব স্যারও আসছেন। আর আমি আপনার কারণে উনার চাকরি খাইছি... (ইইই...ইই) ওপাশে হেড স্যারের কান্নার আওয়াজ পাওয়া গেল।

কী হলো? হ্যালো? হ্যালো??

ডা. ওবায়দুল্লাহ আরো কিছুক্ষণ হ্যালো হ্যালো করলেন ওপাশে কি হেড স্যার ফোন রেখে দিলেন না কেটে দিলেন!

না, শেষ পর্যন্ত অজিত স্যারকে নোবেল দেওয়া হয়নি। তাতে কী তাঁর সূত্র 'জিৎ থিওরাম' এখন পদার্থবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। তবে অজিত স্যার আগের মতোই আছেন। স্কুলের চাকরিতে তিনি আর ফিরে যাননি। হেড স্যার আর ডা. ওবায়দুল্লাহসহ স্কুলের গভর্নিং বডির সবাই এসে প্রায় হাতে-পায়ে ধরেছেন স্কুলের হেড স্যার হওয়ার জন্য। তিনি রাজি হননি। তিনি এখন চুপচাপ বসে... দিস্তা দিস্তা কাগজে এখনো অঙ্ক করেন। মাঝে মাঝেই দেশের গুরুত্বপূর্ণ মানুষেরা আসেন তাঁর কাছে। হেড স্যারও মাঝে মাঝে আসেন। অজিত স্যারের পায়ের কাছে কাচুমাচু ভঙ্গিতে বসে থাকেন। 'উপরে উঠে বসুন' বললে তিনি বলেন 'ছিঃ ছিঃ কী বলেন... আমরা আপনার পায়ের ধূলিকণা সম...' অজিত স্যার ঠিক বুঝতে পারেন না এই লোকটা কি ঠাট্টা করছে নাকি, কে জানে!

বিজ্ঞান স্যার

'মোতালেব হোসেন মডেল হাই স্কুল'-এর ক্লাস সিক্সের বিজ্ঞান ক্লাসে মজিদ স্যার আজ পড়াবেন টেলিভিশন। যদিও তিনি বাংলায় এম এ কিন্তু কিন্তু এম এইচ মডেল হাই স্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের একটু অভাব থাকায় মজিদ স্যার মাঝে মাঝেই বিজ্ঞান ক্লাস নেন। আজ তিনি পড়াবেন টেলিভিশন কীভাবে কাজ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁদের বিজ্ঞান বইয়ে টেলিভিশনের ওপর একটা চ্যাপ্টারই আছে। মজিদ স্যার বাংলায় এম এ হলেও বিজ্ঞান-এর ব্যাপারে খুবই সিরিয়াস এবং অত্যন্ত বিজ্ঞানমনস্ক। সব কিছুর মধ্যে তাঁর বিজ্ঞান। বিজ্ঞান বিষয়ক অদ্ভুত সব প্রশ্ন তাঁর মাথায় ঘোরে সব সময়। যেমন একদিন ক্লাসে এসে বললেন–

- রঙিন টেলিভিশন আবিষ্কার হয়ে কাদের কোনো লাভ হয়নি?

কেউ হাত তোলে না।

- কী হলো কেউ পারিস না? সবাই মাথা নাড়ে।

- নিউটনের নখের ময়লা কোথাকার। স্যার বিড় বিড় করে গালি দেন তাঁর গালি গুলিও বিজ্ঞানমনস্ক! তারপর নিজেই উত্তর দেন–

- টেলিভিশন আবিষ্কার হয়ে জেব্রা আর পাণ্ডাদের কোনো লাভ হয়নি।

- কেন স্যার?

আরে গর্দভ জেব্রা আর পাণ্ডার ছবিও দেখিসনি? স্যার খিঁচিয়ে উঠেন। জেব্রা আর পাণ্ডা সাদা-কালো প্রাণী...তাও জানিস না।

'তারপর জেব্রা আর পাণ্ডা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। যদিও ঐদিন পড়ানোর কথা ছিল টেলিভিশন কীভাবে কাজ করে।

যাহোক, বিজ্ঞান স্যার এসে হাজির হলেন।

আজ তোদের কী পড়াব?

স্যার টেলিভিশন। সবাই একসঙ্গে চেঁচায়।

হুম... বল তো সাদাকালো টিভি আর রঙিন টিভির পার্থক্য কী?

কেউ হাত তোলে না।

কেউ জানিস না–এ কেমন কথা?

এ সময় একজন সাহস করে হাত তুলল।

- বল

- স্যার সাদাকালো ১২ ইঞ্চি টিভির দাম সাত হাজার টাকা। আর রঙিন ১২ ইঞ্চি টিভির দাম ১৪ হাজার টাকা।

স্যার কিছুক্ষণ গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইলেন। মনে হয় বিজ্ঞানমনস্ক গালি দিতেও ভুলে গেলেন। তারপর বললেন, 'ভেরি গুড যাও বাইরে গিয়ে একটি রঙিন ছয় ইঞ্চি ইট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক দশ মিনিট।'

উত্তরদাতা হাসিমুখে ছুটে বেরিয়ে গেল। এই স্যারের ক্লাস করার চেয়ে বাইরে গিয়ে দু হাতে ছয় ইঞ্চি ছয় ইঞ্চি মোট ১২ ইঞ্চি রঙিন ইটের ভার বহনও উত্তম।

যাহোক, ক্লাস চলতে লাগল স্যার এবার নিজেই সাদাকালো আর রঙিন টিভির ব্যাখ্যা দিলেন ' সাদাকালো টিভিতে যেটা মুলা রঙিন টিভিতে সেটাই গাজর!'

তো এভাবেই চলছিল বিজ্ঞানচর্চা। কিন্তু একদিন বিজ্ঞানচর্চায় ব্যাঘাত ঘটল। স্যার ক্লাসে একটা জ্যান্ত ব্যাঙ নিয়ে ঢুকলেন একটা জারে করে। তারপর সেটা টেবিলের ওপর রেখে বললেন-

তোরা এই ব্যাঙ সম্পর্কে কে কী জানিস?

একজন হাত তুলল।

বল

স্যার, ব্যাঙকে চুমু দিলে রাজপুত্র হয়।

কোথায় পেয়েছিস রে হারামজাদা? স্যার যেন রাগে ফেটে পড়লেন।

স্যার রূপকথার বইতে

তবে রে ফাজিলের ফাজিল... বিজ্ঞানের ক্লাসে রূপকথা? এদিকে আয় আয় বলছি... নে এই ব্যাঙটাকে রাজপুত্র বানা...

না, শেষ পর্যন্ত ঐ দিন ক্লাসে কোনো রাজপুত্রের আবির্ভাব ঘটেনি। তবে হেড স্যারের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি ক্লাসের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন 'মজিদ সাহেব আপনি কাল থেকে এদের বাংলা ক্লাসটাই নেবেন। আপনি বাংলায় বিএ বিএড ব্যাঙ নিয়ে ঘুরছেন ঠিক মানায় না।' হেড স্যারের নজর তখন টেবিলের ওপর ব্যাঙটার দিকে। 'আর তা ছাড়া আমরা বিজ্ঞানের একজন ভালো শিক্ষক পেয়েছি। পদার্থবিজ্ঞানে এমএসসি...

সবাই খেয়াল করল বিজ্ঞানমনস্ক বাংলা স্যারের চোয়ালটা মাধ্যাকর্ষণের কারণেই বোধকরি একটু নিচের দিকে ঝুলে পড়ল যেন। জারের ভেতর ব্যাঙটা তখনও ছটফট করছিল।

রোজগার

মজি'র মনটা আজ খুব খুশি খুশি। কারণ তার মা তাকে একটা টুকরি কিনে দিয়েছে। সে আজ থেকে এই নতুন বাজারের একজন মিস্তি। অন্য মিস্তিদের মতো সে টুকরিটার ভেতরে শুয়ে আছে। তাকে দেখে জিকু বলল–

- কিরে পিচ্চি তুইও আমগো ভাত মারতে আইলি?

মজি হাসে। তার চোখ অবশ্য গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাটার দিকে। গাড়ি এলে সে ছুটে যাবে, মিস্তিদের এটাই নিয়ম। আর ঠিক তখনই লাল রঙের একটা বেশ বড়সড়ো গাড়ি ঢুকল। সে পড়িমরি করে ছুটে গেল গাড়িটার কাছে। তার ছোট্ট বুকটা ধুকপুক করছে। তাকে নেবে তো? নিলেই দশ টাকা!

লাল গাড়িটার ভেতর সুন্দর মতো মোটাসোটা এক মহিলা বসা। মহিলা মজির দিকে তাকাতেই মজি চেঁচিয়ে বলল, 'আফা আমারে নিবাইন?'

মহিলা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালেন। মুখটা সরু করে আদুরে ভঙ্গিতে বললেন–

- তুমি এই পিচ্চি মিস্তি হয়েছ?

মজি মাথা নাড়ে আবার বলে, 'আফা আমারে নিবাইন?'

মহিলা গাড়ি থেকে নামতেই জিকু আর আফজাল ছুটে এল। তারাও মিস্তি তবে মজির থেকে একটু বড়সড়ো আর মজির মতো ছোট্ট আর টিংটিঙে না। আফজাল বলল–

- আফা, ও পারব না ... নতুন মিস্তি

আপা... মানে মহিলাটা সবার দিকে তাকিয়ে সুন্দর করে হেসে বললেন–

- কিন্তু ঐ তো আগে এল।
- আইলে কী হইব? হে তো নতুন।
- আইচ্ছা ওরেই নেন। বলে জিকু 'তয় ও কইলাম দুই কেজির বেশি টানতেই পারব না ... আমি কয়া দিলাম।' ওরা দুজনেই হি হি করে হাসে। মজির নতুন টুকরিটাকে ঠেলা দিয়ে সরে যায় অন্য কোনো গাড়ির দিকে।

মহিলা মজিকে নিয়ে বাজারে ঢোকেন মজির বুকটা তখন আনন্দে ধাঁই ধাঁই করে শব্দ করছে।

মহিলা প্রথমে একটা অনেক বড় মাছ কিনলেন। মাছটাকে কাটালেন। তারপর শাক-সবজি কিনলেন। আরো টুকিটাকি অনেক কিছু কিনলেন কিন্তু কোনোটাই মজির মাথার ঝুড়িতে রাখলেন না। তাঁর সঙ্গে আনা ব্যাগটায় রাখলেন আর ব্যাগটা তিনিই বহন করছিলেন।
- ব্যাগটা আমার মাথায় দেইন। রিনরিনের গলায় বলে মজি।
মহিলার তখন যেন খেয়াল হলো তার সঙ্গে একজন খুদে মিন্তি আছে তিনি চোখ বড় বড় করে বললেন, 'আরে তাই তো আমার সঙ্গে যে একজন মস্ত মিন্তি আছে আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।' বলে মহিলা তার ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা পোঁটলা তার টুকরির মধ্যে আস্তে করে রাখলেন, যেন মজির মাথায় না লাগে। মজি তার মাথায় সেটার ওজন টেরও পেল না। সে আবার রিনরিনে গলায় বলল –
- আরও দেইন
না রে বোকা তুমি খুব ছোট্ট... তোমার ছোট্ট মাথাটায় এত বোঝা দেয়া ঠিক হবে না বুঝলে?

মজি ঠিক বুঝল না তাহলে মহিলা তাকে নিল কেন? তাহলে কি তাকে দশ টাকা দেবে না? নিজেই যখন ব্যাগ টানছেন।

মহিলা খুব দ্রুতই বাজার সারলেন। তারপর বেরিয়ে এলেন মজিকে নিয়ে। মজির মাথার ঝুড়িতে তখনও এই একটাই ছোট্ট পোঁটলা, কোনো ওজনই নাই। মহিলা গাড়ির কাছে এসে বললেন, 'তুমি দাঁড়াও তোমার একটা ছবি তুলি?' মজি খুবই আশ্চর্য হলো তার ছবি কেন? মহিলাটা কি পাগল নাকি?

মহিলা তাঁর হাতের মোবাইল দিয়ে কুট করে একটা ছবি তুললেন আর মুখে বিড় বিড় করে ইংরেজিতে কিছু একটা বললেন মজি বুঝল না।

মহিলার বুড়ো ড্রাইভারটা বাজারের ব্যাগটা গাড়ির পেছনে রাখল আর মজির মাথার পোঁটলাটা মহিলা গাড়ির ভেতরে নিয়ে রাখলেন তাঁর পাশে।

তোমাকে কত দেব?

মজির ইচ্ছে হলো বলে 'বিশ টাকা' আসলে এই বাজারে তাদের রেট দশ টাকা কিন্তু বড়লোক গাড়িওলা সুন্দর মহিলাদের দেখলে জিকু, টিপু, আফজালরা বলে বিশ টাকা কখনো কখনো ত্রিশ টাকাও বলে আর কী আশ্চর্য বড়লোক মহিলারা অনেক সময় দিয়েও দেয়। আবার অনেক সময় দাবড়ানিও দেয়। কিন্তু মজির ঠিক বিশ টাকা বলার সাহসও হলো না। ভয়ে ভয়ে বলল ' দশ টাকা!'

মহিলা মুখে বলল দ...অঅঅ... শ টাকা???

মজির চিন্তা হলো এটা সত্যি যে তার তো কোনো কষ্টই হয়নি। একটা ছোট্ট পোঁটলা ছিল তার মাথায়, দশ টাকা অনেক বেশি। তাই সে বলল 'আইচ্ছা পাঁচ টাকা দেইন'

মহিলা ভ্রু কুঁচকে তার দিকে তাকালেন। এবার মজির ভয় হলো তাহলে কি পাঁচ টাকাও দেবে না মহিলাটা?

তবে না মহিলা তাঁর ব্যাগ থেকে একটা নোট বের করে বলল, 'নাও'। মজি ঠিক বুঝল না এটা কত টাকা। দশ টাকার নোটটা তার চেনা। সে নোটটা হাতে নিয়ে বলল, 'পাঁচ ট্যাকা দেইন' মহিলা এবার শব্দ করে হেসে ফেললেন। আবারও মুখটা সরু করে বললেন, 'আহারে বোকা, টাকাও চেনে না এটা পঞ্চাশ টাকা। আচ্ছা দাও... আমি ঠিক করে দিচ্ছি বলে নোটটা ফেরত নিয়ে তিনি পাঁচটা দশ টাকার চকচকে নোট দিলেন। এবার মজির মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল যেন। সে পাঁচটা দশ টাকার নোট পেল?? এমনি এমনি?' সে অবাক হয়ে তাকাল মহিলার দিকে। মহিলা তার দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে হাত নাড়লেন। গাড়ি স্টার্ট নিয়ে পেছাতে শুরু করেছে। আর মহিলা তার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়েই যাচ্ছেন।

মজি দ্রুত টাকাটা তার ছেড়া প্যান্টটার গোপন পকেটে ঢুকিয়ে ফেলে আফজালটা যদি টের পায় তাহলে সমস্যা আছে। মিন্তিদের মধ্যে ও সবচেয়ে বদ। একবার টিপু'র টাকা চুরি

করেছিল। মজি টুকরিটা মাথায় নিয়ে ছুট দিল রেললাইনের দিকে। ওখানে বস্তিতে তার মা থাকে। মাকে তার প্রথম উপার্জনটা দিয়ে আসা দরকার। মা নিশ্চয়ই খুশি হবে। প্রথমবারেই পঞ্চাশ টাকা।

রেললাইনের কাছে এসে হতভম্ব হয়ে গেল মজি। 'একি তাদের বস্তি কই?' একটা ভয়ানক ধরনের হলুদ রঙের গাড়ি গোঁ গোঁ শব্দ করে তাদের ভাঙা ঘরবাড়িগুলো নতুন করে ভাঙছে। আশপাশে অনেক পুলিশ আর বস্তির উত্তেজিত লোকজন। এই সময় কে যেন তার হাত চেপে ধরল। তাকিয়ে দেখে তার মা।

মজি রে আমগো ঘর–বাড়ি তো ভাইঙা দিছে এহন কী হইব? রাইতে ঘুমাইবি কই?

মজির অবশ্য খুব চিন্তা হয় না। তার মনে হয় তার তো মিন্তি'র টুকরিটাই আছে ওর ভেতর দিব্যি ঘুমানো যায়। সে মায়ের দিকে তাকায় মার মুখটায় কেমন যেন শঙ্কার ভাব। এ সময় পুলিশ মাইকে চিৎকার করে কিছু বলে মজি বোঝে না। তবে আশপাশে একটা হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। ঠাস করে একটা শব্দ হয়। এই শব্দটা মজি বুঝে টিয়ার সেলের শব্দ। বস্তির লোকদের সরাতে পুলিশের এই আয়োজন। মজির মা মজির হাত ধরে টান দেয়।

মজি 'ল যাই ...এই খানে থাকলে পুলিশে ঘারাইব। মা তার হাত ধরে রেললাইন ধরে দ্রুত হাঁটা দেয়। অনেকেই ছুটে সরে যাচ্ছে। যেন পালাচ্ছে। এই শহরের অনেক রহস্যের মতো এই হঠাৎ পালানোর রহস্যটা মজি ধরতে পারে না। মায়ের লম্বা লম্বা পায়ের সাথে তাল মিলিয়ে সে তার ছোট ছোট পায়ে ছুটতে থাকে, তার নতুন টুকরিটা শক্ত করে ধরে থাকে আরেক হাতে। মাকে বলাই হয়নি সে পঞ্চাশ টাকা রোজগার করেছে আজ। টাকাটা এখনো প্যান্টের পকেটেই আছে নিরাপদে।

মন্টুর মামা

মন্টুর মা ভয়ানক একটা স্বপ্ন দেখেছেন মন্টুকে নিয়ে। তিন–চারজন সন্ত্রাসী হঠাৎ তাদের একতলা বাসায় ঢুকে মন্টুর কলার ধরে... উফ বাকিটা আর চিন্তা করতে পারেনা না মন্টুর মা। ঘুমটা ভাগ্য ভাল যে তখনই ভেঙে যায়। উঠে গিয়ে মন্টুর ঘর থেকে ঘুরেও আসেন ছেলেটা হাত ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। কাল সকালেই একটা মুরগি জানের ছদকা দিতে হবে।

পরদিন সকালে নাশতার টেবিলে মন্টুর বাবাকে স্বপ্নের কথাটা বলতে যাবেন এ সময় বাইরে কলিং বেল বেজে উঠল।

কে?

আমি, আমি আপা দরজা খোলো

দরজা খুলতেই দেখা গেল। মন্টুর ছোট মামা মাহবুব।

- কিরে তুই সাতস-কালে?
- মন্টু কই?
- ও তো ঘুমুচ্ছে।
- উফ দশটা বাজে এখনো ঘুম?
- আহ, আজ ছুটির দিন না? আয় ভেতরে আয়।
- জলদি ওকে ডেকে তোলো ওকে নিয়ে এক জায়গায় যাব।
- কোথায়?
- আরে মজার জায়গা, ওর ভালো লাগবে।
- সে না হয় যাস। তুই ভাই একটা কাজ করে দে।
- কী?
- মন্টুকে নিয়ে খুব বাজে একটা স্বপ্ন দেখেছি একটা মুরগি ছদকা দিয়ে দিবি?
- অবশ্যই... টাকা দাও। বোঝই তো বেকার মানুষ

- সে তো দেবই।

মন্টুকে ডেকে তোলা হলো। এবং সে যখন শুনল তার ছোট মামা এসেছে তাকে কমিকনে নেওয়ার জন্য তখন মোটামুটি সে লাফিয়ে উঠে রেডি হলো। নাকে-মুখে কিছু গুঁজে ছুটল ছোট মামার সাথে। মা পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল–

- এই মাহবুব একটা মুরগি কিনে ছদকা দিস কিন্তু
  দেব দেব

তারা চলে গেল। দিনের কাজকর্ম করতে করতে মন্টুর মা'র মাঝে মাঝেই মনে হলো স্বপ্নটার কথা। আচ্ছা মাহবুব জানের ছদকাটা মনে করে দেবে তো? ভাইটা তার একটু পাগলেটে আছে। একটা ফোন দিয়ে মনে করিয়ে দিলে কেমন হয়। আর কখন ফিরবে জানা দরকার। কিন্তু ফোন আর করা হলো না। গাধাটা অবশ্য ফোন করলে ধরেও না।

দুপুরের একটু পরে কলিং বেল বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখে মন্টু।

- কিরে তোর মামা কই?
- মামা আমাকে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।
- কেমন মজা হলো?
- ভালো, কস্ট প্লে দেখলাম
- এটা আবার কী?
- সবাই কমিকসের চরিত্রগুলো সেজে আসে।
- আচ্ছা তোর মামা মুরগির ছদকা দিয়েছিল?
- এ্যাঁ... মনে হয় দিয়েছে।
- মনে হয় দিয়েছে মানে?

না মানে... দেখলাম তো তোমার ছদগার টাকায় আস্ত এক মুরগির গ্রিল কিনে একাই খেল। আবার বলল, 'তোর মাকে বলিস আমার মতো বেকার এর চেয়ে গরিব আর কে আছে!'

মন্টুর মা ধপ করে পাশের চেয়ারটায় বসে পড়লেন।

ভালো ছেলে

বড়লোকের ছেলেটা তার ঝকঝকে বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা হট ডগ খাচ্ছিল। বাইরে নিচু দেয়ালের এ পাশে দাঁড়িয়ে খালি গায়ের গরিব ছেলেটা উঁকি মেরে দেখার চেষ্টা করছিল। একসময় গরিব ছেলেটা প্রশ্ন করে বসল–

কী খাও? যেন এ ধরনের প্রশ্ন যে কাউকেই করা যায়।

বড়লোকের ছেলেটা ভাবল উত্তর দেবে না কি মনে করে বলল, 'হট ডগ'

কী?

হট ডগ

গরিব ছেলেটি বুঝতে পারল না নামটা। এবার সে তার দ্বিতীয় প্রশ্নটা করল।

পুরাটাই খাইবা?

এ প্রশ্নটা বড়লোকের ছেলেটা বুঝতে পারল না। তবে মাথা নাড়ল। মানে সে পুরোটাই খাবে। তবে না, কী মনে করে সে তার না খাওয়া শেষ টুকরোটা ছুড়ে দিল গেটের বাইরে।

গরিব ছেলেটি তার কাঁধের ঝোলাটা যেটাতে রয়েছে দুনিয়ার ময়লা কাগজ পলিথিন নোংরা নেটের ব্যাগ, সেটা নামিয়ে রেখে ছুটে গিয়ে বস্তুটি ফুঁ দিয়ে ধুলো সরিয়ে আগ্রহ ভরে খেল।

দয়া করে এড়িয়ে যাবেন না

বাংলাপিডিএফ এ আপলোডকৃত বইসমূহ আপনার নিজের ওয়েবসাইট/ব্লগ/সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করার সময় দয়া করে অরিজিনাল আপলোডারদের ক্রেডিট দিন। দিনে দিনে পিডিএফ বইয়ের সংখ্যা যে কমে আসছে তার অন্যতম প্রধাণ কারন অবাধে এক ওয়েবসাইটের বই অন্য ওয়েবসাইটে কোন প্রকার মেনশন করা ছাড়াই শেয়ার করা। এর মধ্যে কেউ কেউ তো আবার আরেকজনের আপলোড করা বই ওয়াটারমার্ক লাগিয়ে নিজের বলেও চালিয়ে দিচ্ছেন। এটা খুব দ্রুত বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাপিডিএফ থেকেও অনেক আপলোডার হারিয়ে গেছেন শুধুমাত্র এইসব পিডিএফ চুরির কারনে। অল্প গুটিকয়েক যেসব আপলোডার আছেন, তাদেরও অনেকে নিয়মিত পিডিএফ আপলোডে উৎসাহ পান না। কাজেই তাদের ধরে রাখার দায়িত্তটা আপনাদের পাঠকদের নিতে হবে। আমাদের বই শেয়ার করেন, তাতে আপত্তি নাই। কিন্তু দয়া করে ওয়েবসাইটের নাম উল্লেখ করে করুন। এতে আপনাদের ওয়েবসাইটের ভিজিটর কিন্তু কমে যাবে না, উলটো সবাই আপনাদের সততার প্রশংসাই করবে। পিডিএফ কমিউনিটিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবেন না।

বাংলাপিডিএফ এ ডোনেট করতে চাইলে সরাসরি ওয়েবসাইট থেকে পেপালের মাধ্যমে করতে পারবেন। আর বিকাশ নাম্বার প্রয়োজন হলে মেইল করুনঃ banglapdf@yahoo.com এই ঠিকানায়!

ধন্যবাদ সবাইকে।

Banglapdf.net

জিনিসটা সুস্বাদু সন্দেহ নেই। যদিও তার ভাগে খুব সামান্যই ছিল।

তোমার সাইকেল নাই? তৃপ্ত কৃতজ্ঞ গরিব ছেলেটি প্রশ্ন করে।

আছে

চালাইবা না?

মাথা নাড়ালো বড়লোকের ছেলেটা।

চালাও আমি ঠেলমু নে। যেন ঐ খাদ্যের বিনিময়ে এই পরিশ্রমটি সে করতে রাজি আছে।

বড়লোকের ছেলেটি কিছু বলল না। চলে গেল। গরিব ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে রইল বাইরে, এই আশায় হয়তো বড়লোক ছেলেটি তার দামি সাইকেলটা চালাবে। আর সে পেছন থেকে ঠেলবে। অবশ্য সে সুযোগ যদি বড়লোক ছেলেটা দেয় এবং কী আশ্চর্য ছেলেটি সত্যি সত্যি সাইকেলটা নিয়ে বাইরে এল এবং গেটের ওপাশে দিব্যি কিছুক্ষণ চালাল গরিব ছেলেটাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। ঠেলা ছাড়াই। গরিব ছেলেটি বুঝতে পারছে না। সে কি গেট ঠেলে ঢুকে পড়বে? কিন্তু এ ধরনের পূর্ব অভিজ্ঞতা তার ভালো না। তাই সে ঠিক সাহস করল না। অবশ্য আশপাশে কোনো দারোয়ান নেই।

বড়লোক ছেলেটি সাইকেল চালিয়ে গেটের কাছে এল এবং বলল

তুমি চালাবে?

গরিব ছেলেটি তার দুই কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না। সে দ্রুত তার ছোট্ট মাথাটি নাড়ল। অর্থাৎ তার যথেষ্টই আগ্রহ আছে।

তাহলে তোমার ব্যাগটা বাইরে রেখ এসো।

তাই করল গরিব ছেলেটি। যদিও তার মূল্যবান ঝোলাটি খোয়া গেলে কপালে দুঃখ আছে। তারপরও এই অসামান্য সুযোগের জন্য সে এই ঝুঁকি নিল।

সাইকেলটার সিটে বসে প্যাডেল মারতে গিয়ে শেষ রক্ষা হলো না। আছড়ে পড়ল গরিব ছেলেটি। শব্দে ছুটে এল এক সুন্দরী মহিলা। তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি।

এই জনি? একে?

আমার হট গড খেল যে

মানে?

ছেলেটি তখন ইংরেজিতে কিছু বলল। গরিব ছেলেটি বুঝতে পারল না। সম্ভবত সুন্দরী মহিলাটি ছেলেটির মা। সেও তীব্র স্বরে ইংরেজিতে কিছু বলল। গরিব ছেলেটি দ্রুত সাইকেলটি দাঁড় করিয়ে গেটের বাইরে চলে এল। ইংরেজি না বুঝলেও সে বুঝে গেছে পরিস্থিতি ভালো নয়। বাইরে থেকে দেখল মা ছেলেটিকে নিয়ে ভেতরে চলে গেছে। দেয়ালের পাশে সুন্দর ঝকঝকে সাইকেলটা তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে একা।

কোত্থেকে একটা মুশকো দারোয়ান চলে এসেছে তখন গেটের কাছে। দারোয়ানটাকে হয়তো কিছু বলা হয়েছে দারোয়ানটা গেটের কাছে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। ব্যাগ কাঁধে গরিব ছেলেটিকে খেয়াল করল না।

গরিব ছেলেটি তার পথ ধরে হাঁটা দিল। সে সিদ্ধান্ত নিল বড়লোক হলেও ছেলেটি ভালো। বেশ ভালো। তার ছোট্ট পাকস্থলিতে হারিয়ে যাওয়া হট ডগের টুকরোটি'র একটি উষ্ণ ঢেঁকুর ওঠে গলা পর্যন্ত।

রায়হানের সমস্যা

সব জায়গায় ব্যাপারটা কিন্তু ঘটে না।

তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন ঐ একটা নির্দিষ্ট ঘরে ঘুমালে ব্যাপারটা ঘটে?

জি।

অন্য ঘরে আপনি ঘুমিয়ে দেখেছেন?

জি দেখেছি।

ওটা হয় না?

না

আচ্ছা... সাইকিয়াট্রিস্ট নোট করেন।

সমস্যাটা রায়হানের নিজস্ব। রায়হানরা তাদের নতুন ফ্ল্যাট বাড়িতে উঠে আসার পর রায়হান তার ঘরে একাই ঘুমায়। তার ঘরটা বাসার আরেক মাথায়। আসলে এটা তাদের গেস্ট রুম ছিল। বাসায় এখন মানুষ বেশি বলে গেস্ট রুমটাই তার রুম। রায়হানের বয়স কত? খুব বেশি হলে পঁচিশ। ভার্সিটির পড়াশোনা শেষ করে সে এখন বেকার। তবে বেকার জীবনটাই তার ভালো লাগছে। চাকরি পেলেই তো...আবার ব্যস্ত হয়ে উঠতে হবে।

আচ্ছা সব দিনই কি ব্যাপারটা ঘটে?

না। সব দিন না। দু-একদিন গ্যাপ দিয়ে দিয়ে।

হুম

পর পর দুদিন হয়েছে বিষয়টা কখনো?

না।

ফ্রিকোয়েন্সিটা কেমন?

ধরেন এক সপ্তাহে তিন দিন।

আচ্ছা।

রায়হানের সমস্যাটা অদ্ভুত। প্রথমবারের ঘটনা বলা যাক। রাতে ঘুমানোর আগে দু গ্লাস পানি খাওয়া তার অভ্যাস। যার ফলশ্রুতিতে তিনটা-সাড়ে তিনটার দিকে তার টয়লেটে যেতেই হয় তলপেটের চাপে। ব্যাপারটা যেদিন ঘটল দিনটা ছিল শনিবার। সেদিন সে একটায় শুয়ে পড়ে। রাত ঠিক সাড়ে তিনটায় তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ঘুম চোখে সে উঠে বসল বিছানায়। অন্ধকার চোখে একটু সয়ে আসতে একটু সময় লাগে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করে সে। অন্ধকারটা সয়ে আসতেই সে উঠে দাঁড়াল টয়লেটে যাওয়ার জন্য আর তখনই তার মনে হলো। তার ঘরটা বেশ বড় এবং তার খাটের একটু পাশে আরেকজন শুয়ে আছে আরেকটা খাটে। চাদরে ঢাকা তবে একটা পা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আপনি কখনো ঐ পাটা ছুঁয়ে দেখেছেন

- না

- ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করেনি?

- করেছে। কিন্তু ভয় লাগে

- যে শুয়ে থাকে সে কি পুরুষ না মেয়ে?

- জি পুরুষ

- হুম। আচ্ছা একটা কাজ কি করা যায়?

- কী?

- একদিন আপনি পানি না খেয়ে ঘুমালেন। রাতে উঠতে হলো না আর ঐ জিনিস দেখতে হলো না।

- আমি তাও করেছি। কিন্তু তিনটা–সাড়ে তিনটায় আমার ঘুম ঠিকই ভেঙে যায়।

- আচ্ছা...

সাইকিয়াট্রিস্টের চেম্বার থেকে বের হয়ে এসে রায়হান একটা সিগারেট ধরায়। সে ঠিক বুঝতে পারছে না সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গিয়ে আদৌ তার কোনো লাভ হচ্ছে কি না। এই সাইকিয়াট্রিস্ট নামকরা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তবে রায়হানের মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। সে এটা আজ করবে, করবেই।

শেষ রাতে ঘুম ভাঙল। অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসলে সে খেয়াল করল। যথারীতি সেই লোকটা তার খাটের প্রায় পাশেই লম্বালম্বি শুয়ে আছে। একটা পা দেখা যাচ্ছে। রায়হানের বুকটা ধক করে উঠল। সে উঠে গিয়ে তার পায়ে হাত রাখল। ঠাণ্ডা একটা পা। যেন মৃত মানুষ।

- তারপর?

- তারপর আমি ওর পা ধরে একটা ঝাঁকি দিলাম।

- ভয় করছিল না?

- করছিল... কিন্তু আমি বেপরোয়া।

- তারপর ?

- লোকটা চাদর সরিয়ে উঠে বসল।

- উঠে বসল?

- হ্যাঁ

- তারপর? সাইকিয়াট্রিস্টের চোখে মুখে যথেষ্ট কৌতূহল।

- দেখলাম বয়স্ক একটা লোক। এবং লোকটা আমি নিজেই। আমারই বয়সের আরেক রায়হান।

- বলেন কী?

- জি তাই...

- তারপর?

- তারপর ভয়ের চোটে আমি ছুটে টয়লেটে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি আমার ঘরটা আগের মতো। বাকি রাত লাইট জ্বালিয়ে ঘুমালাম।

২

এরপর আর কখনো রায়হান সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেল না। আসলে তার বেকার জীবনে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে বার বার যাওয়াটা বেশ ব্যয়বহুল হয়ে উঠছিল। নামকরা সাইকিয়াট্রিস্ট অবশ্যই তার ভিজিটটাও নামকরা। পুরনো রোগীর ক্ষেত্রে কিছু কম হলেও রায়হানের জন্য কষ্টকর। আর নিজের সমস্যার সমাধান করেছে সে লাইট জ্বালিয়ে। লাইট জ্বালিয়ে ঘুমায় রাতে।

তবে এক লাইট জ্বলা রাতে সমস্যা হলো। ঘুমিয়েই পড়েছিল সে তন্দ্রা মতো অবস্থা চোখের পাতা লেগে আসছে আসছে ভাব। এই সময় কেউ তার পা ধরে ঝাঁকি দিল বেশ জোরে। ধরমর করে উঠে বসল রায়হান...!

৩

(বোঝা গেল? ঘটনাটা... ??)

* এই গল্পটা আমার অন্য একটা বইয়ে অন্যভাবে আছে!

ফেলটুস

হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় আবির এবার তিন বিষয়ে ফেল করেছে। তাকে অবশ্য খুব বেশি চিন্তিত মনে হচ্ছে না। সে রিপোর্ট কার্ড নিয়ে ক্লাসে বসে আছে। ক্লাসের আর সবাই হৈচৈ করে বের হয়ে গেছে রেজাল্ট কার্ড নিয়ে বাড়ির দিকে। কিন্তু আবির বসে আছে। বাসায় গিয়ে কী বলবে, সেটা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

স্কুল ছুটি অনেক আগেই হয়ে গেছে। স্কুলের বুড়ো দপ্তরি ক্লাসরুমে তালা দিতে দিতে আসছে। তাদের ক্লাসটা সবার শেষে। আবির ঘাঁপটি মেরে বসে রইল। বুড়ো দপ্তরি ক্লাসে ঢুকে এক এক করে জানালাগুলো লাগাল। আবির সাবধানে বেঞ্চের নিচে ঢুকে গেল। দপ্তরি তৈয়ব নানা দরজার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তালা লাগিয়ে চলে গেল। এখন সমস্ত ক্লাসে আবির একা। সব লাগানো হলেও জানালা-দরজার ফাঁক দিয়ে দিব্যি আলো আসছে ঘরটাকে অত অন্ধকার লাগছে না।

আবির কিছুক্ষণ ক্লাসে একা একা হাঁটাহাঁটি করল। বোর্ডে উল্টাপাল্টা লিখল কিছুক্ষণ তারপর ডাস্টার দিয়ে মুছে একটা বাড়ি আঁকল পাশে একটা গাছ পেছনে নদী। নদীতে নৌকা। পেছনে দিগন্ত। দিগন্তের পাশে একটা সূর্য। গাছের নিচে ঝোপে একটা সাপ আঁকল তারপরে মুছে ফেলল সাপটা। রাতে নাকি সাপের নাম নিতে নেই। বলতে হয় লতা আর সে কিনা সাপ এঁকে ফেলল রাত তো হয়েই গেছে ঘরটা অন্ধকার হয়ে আসছে। আর তখনই ভয় ভয় লাগল আবিরের। কাজটা কি ঠিক হলো? এখন তো আর বেরোনোও যাবে না। দরজায় তালা মারা তৈয়ব নানাকে ডাকবে চেঁচিয়ে? হঠাৎ ভীষণ কান্না পেল আবিরের। বেঞ্চে লম্বা হয়ে শুয়ে ফিচ ফিচ করে কাঁদতে লাগল সে।

কাঁদতে কাঁদতেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল আবির নিজেই জানে না। ঘুমিয়ে সে এক ভয়নাক স্বপ্ন দেখল। যেন সে একটা বিশাল মাঠ দিয়ে ছুটছে আর একটা সাপ তাকে তাড়া করেছে। সেই সাপটা যেটাকে সে ক্লাসের বোর্ডে এঁকে আবার মুছে ফেলেছে। সে সাপটা হঠাৎ
মানুষের মতো কথা বলে উঠল।

এই ছেলে দাঁড়াও বলছি

না কিছুতেই না। ছুটতে ছুটতে চেঁচাল আবির

তুমি আমাকে এঁকে মুছে ফেলেছ এর শাস্তি তোমাকে পেতে হবে

কী শাস্তি?

সেটা তোমাকে ধরলেই বুঝতে পারবে।

ছুটতে ছুটতে আবির একটা পাহাড়ের ধারে চলে এল। আর যাওয়ার উপায় নেই। ওদিকে সাপটা ছুটে আসছে। কী করা। হঠাৎ আবিরের মাথায় দারুণ একটা বুদ্ধি এল সে চট করে পকেট থেকে ইরেজারটা বের করে নিজেকে মুছে ফেলল। সাপটা ছুটে এসে হতবাক। কেউ নেই, সে চেঁচাল 'আবির আবির ...তুমি কই তুমি কই?'
আর তখনই আবিরের ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখে ক্লাসের দরজা খোলা সেখানে তৈয়ব নানা আর বাবা দাঁড়িয়ে। বাবা এসে তাকে কোলে তুলে নিলেন। তৈয়ব নানা তার ব্যাগটা হাতে নিল। তবে আশার কথা, দুজনের মুখই বেশ হাসি হাসি। বাবা কি জানেন সে তিন বিষয়ে ফেল করেছে। কে জানে! তবে ক্লাস ফোরের ছেলে বাবার কোলে একটু লজ্জা লজ্জা লাগছিল আবিরের। তবে এতোই ঘুম পাচ্ছিল তার যে সে ফের ঘুমিয়ে গেল বাবার কোলে।

জেগে থাকলে আবির টের পেত স্কুলের গেটের কাছে মাও দাঁড়িয়ে ছিলেন। মার চোখ ফোলা ফোলা। এসব অবশ্য আবির টের পেল না। সে গভীর ঘুমে তখন বাবার কাঁধটাকে বালিশ বানিয়ে।

পরদিন যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবেই দিনটা শুরু হলো। সে যে তিন বিষয়ে ফেল করেছে এটাও কোনো বিষয় না। শুধু মা নাশতা খাওয়ার সময় বললেন 'কার্টুন দেখা একটু কমাতে হবে বাবা, আর বেশি করে পড়তে হবে... এখন থেকে ঠিক আছে... '

আবির জোরে মাথা ঝাঁকাল।

আবির একাই স্কুলে যায় আজ মা পৌঁছে দিলেন। এবং আবিরকে অবাক করে দিয়ে বললেন ছুটির সময় এসে নিয়ে যাবেন।

আবির একটু চিন্তায় ছিল। রিপোর্ট কার্ড জমা নেওয়ার সময় আবিরকে নিশ্চয়ই কথা শোনাবেন স্যার। আর অন্যরা হাসবে। কিন্তু তেমনটা হলো না। গিয়ে দেখে সবাই ভিড় করে গতকাল রাতে বোর্ডে আঁকা তার ছবিটা দেখছে সবাই, স্যার পর্যন্ত!!

কে এঁকেছে ছবিটা ?

সত্যি দারুণ।

ছেলের হাতে মুন্সিয়ানা আছে বলতে হবে। স্যার মাথা নাড়িয়ে বলেন। আবিরের ভীষণ আশ্চর্য লাগে এখন রোল কল করার কথা সেসব বাদ দিয়ে সবাই তার আঁকা ছবি দেখছে! একসময় পেছন থেকে সে বলেই ফেলে চেঁচিয়ে 'স্যার ছবিটা আমিই এঁকেছি!' সবাই ঘুরে তাকাল তার দিকে।

তুই এঁকেছিস? সবার চোখে অবিশ্বাস!

কখন আঁকলি? স্যার সন্দেহ প্রকাশ করেন

স্যার ছুটির পর। সবাই চলে গেল খালি ক্লাসে আমি...।

সবাই চলে গেল আর তুই খালি ক্লাসে একা একা জয়নুল আবেদিন হয়ে গেলি? সবাই হেসে ফেলল, আবিরও।

আর এই করতে করতে স্যার কখন যে সব রিপোর্ট কার্ড জমা নিয়ে ফেললেন। আবিরেরটাসহ, কেউ টেরও পেল না আবিরের তিন সাবজেক্টে ফেল করার ব্যাপারটা।

তবে আবির যে দারুণ আর্টিস্ট সেটা সবাই টের পেয়ে গেল। সব কিছুরই একটা ভালো দিক আছে। বলতেই হবে। তবে না আবির এখন পড়াশোনার সিরিয়াস। ফেলটুস আর্টিস্ট সে আর হতে চায় না।

কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে

রতনের কাছে বিষয়টা আজ মিনারেল ওয়াটারের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। কারণ একটু আগে সে বাবাকে বলতে শুনেছে বাবা ফিস ফিস করে মাকে বলছে–

তোমার মনে পড়ে? ওকে কুড়িয়ে পাওয়ার দিনটার কথা? একটা ডাস্টবিনের পাশে নোংরা কাঁথায় জড়ানো...? উফ, কী ভয়ানক দৃশ্য... শীতে থির থির করে কাঁপছিল বাচ্চাটা।

এইটুকু শুনেই রতনের মাথাটা যেন চার ব্লেডের ফ্যানের মতো বন বন করে ঘুরতে লাগল। তাহলে সে সত্যিই কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে? যেটা সে এত দিন ধরে সন্দেহ করছিল?! উফ... পৃথিবীটা কী নিষ্ঠুর! রতন আর ভাবতে পারে না। রতন নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে লেপ মুড়ি দিয়ে।

মা একসময় এসে ডাকেন।

- কিরে রতন অবেলায় শুয়ে আছিস যে?

রতন উত্তর দেয় না। মটকা মেরে শুয়ে থাকে। মা বিড় বিড় করে কী সব বলে। নিশ্চয়ই গালি দিচ্ছে... কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেকে আর কী বলবে।

বিষয়টা খুলেই বলা দরকার।

রতনেরা দু'ভাই বোন। বোন বড় আর রতন ছোট। বোনের প্রতি তার বাবা-মার যে আদর, যখন-তখন এটা-সেটা কিনে দেয়া। আর তার বেলায় চৌদ্দবার চাইলে তারপর দেয়। পদে পদে বকা আর গালি। তখনই প্রথম সন্দেহ হয় রতনের, নিশ্চয়ই সে তাদের আসল সন্তান নয়। ধার করা বা কুড়িয়ে পাওয়া। এই তো দুদিন পর বড় আপুর জন্মদিন তার কী তোরজোর চলছে কাকে কাকে দাওয়াত করা হবে কী দেয়া হবে। আর তার জন্মদিনের সময়? বাবা ডেকে বলে

- কিরে রতন তোর জন্মদিন এবার হবে নাকি? মা বলেন

- ছেলেদের আবার জন্মদিন কী? তখন বাবা সায় দেন।

- ঠিক, ছেলে হবে রাফ অ্যান্ড টাফ... কোনো ইমোশন দিয়ে বড় করা যাবে না। ইংরেজিতে একটা কথা আছে... বলে বাবা কী সব আগডুম বাগডুম লেকচার শুরু করেন ।

বিষয়টা নিয়ে সে তার বেস্ট ফ্রেন্ড রঞ্জুর সাথে একটা সিটিংও দিয়েছিল

- জানিস রঞ্জু আমি কিন্তু আমার বাবা-মার আসল ছেলে না।

- মানে?

- মানে আমাকে ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে।

- তুই কী করে জানলি?

- জানি জানি... আমি ওদের সৎ ছেলে।

- সৎ ছেলে আর কুড়িয়ে পাওয়া এক জিনিস হলো?

ঐ এক কথাই। আমাকে ভালোবাসে না বড় আপুকে ভালোবাসে শুধু।

সব শুনে রঞ্জু সান্ত্বনা দেয়। বিখ্যাত মানুষদের উদাহরণ দেয় রঞ্জু। যারা কুড়িয়ে পাওয়া হলেও জীবন কত বড় বড় মানুষ হয়েছ। শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে রতন। আর বড় হয়ে কী হবে... ছোট বেলাতেই আদর পেলাম না। আমার আসল বাবা-মা যে কোথায় আছে... তাদের কাছে যদি চলে যেতে পারতাম।

তারপর এল সেই দিন মনি আপুর জন্মদিন। সকাল থেকে সবাই তার জন্য ব্যস্ত আর রতনের দিকে কোনো খেয়ালই নেই। মা তো বকা দিয়েই বসল, 'মনির জন্মদিনে মুখটা গোঁজ করে রেখেছিস কেন?' রতন কথা বলে না। এবং তখনই সে ঠিক করে ফেলে পরদিনই বাসা থেকে পালাবে তারপর তার আসল বাবা-মাকে খুঁজে বের করবে।
তবে জন্মদিনের অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত বেশ ভলোভাবেই পার হলো। অনেকেই এল। রতকেও থাকতে হলো। সে বুঝতে দিল না যে পরদিন বাসা থেকে পালিয়ে যাবে, খুঁজে বের করবে তার আসল বাবা-মাকে। কষ্ট করে মুখে একটা নকল হাসি ধরে রাখল।

রাতের বেলা একটা চিঠি লিখতে বসল রতন
বাবা-মা (নকল)
আমি বুঝতে পেরেছি আমি তোমাদের আসল ছেলে না। তোমরা আমাকে কুড়িয়ে পেয়েছ। তাই চলে যাচ্ছি। আমার আসল বাবা-মাকে খুঁজে বের করব। এখন থেকে তাদের কাছেই থাকব। তোমরা তোমাদের আদরের মেয়ে মনিকে (আসল) নিয়ে ভালো থেকো।
ইতি
হতভাগ্য রতন
চিঠিটা কোথায় রেখে যাব যখন ভাবছে তখন মনি আপু ঢুকল। তার মুখটা খুব হাসি হাসি। হবেই তো জন্মদিনে উপহার তো আর কম পায়নি।
- কিরে রতন কী করিস?
- এ্যাঁ ইয়ে কিছু না। দ্রুত চিঠিটা লুকানোর চেষ্টা করে রতন।
- কিরে কী লুকাচ্ছিস? প্রেমপত্র লিখছিস নাকি?
- ধুৎ
- শোন না একটা দারুণ খবর আছে।
- কী? নিরাসক্ত ভঙ্গিতে তাকায় রতন।

- জানিস বাবা-মা আমাকে আজ একটা মারাত্মক খবর দিল।
- কী খবর? শোনার কোনো আগ্রহই বোধ করে না রতন।
- জানিস, আমি না ওদের আসল মেয়ে নই। আমাকে উনারা একটা ডাস্টবিনের পাশে কুড়িয়ে পেয়েছিল। আমার এবার আঠার বছর হলো তো তাই অফিসিয়ালি আমাকে জানাল। মা অবশ্য জানাতে চায়নি। বাবাই জানাল, বাবা বলল, এভরি আইডেনটিটি... থাক এসব বুঝে তোর কাজ নেই।... ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং না? বাবা বলল, 'তুই আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে কিন্তু নিজের সন্তানের চেয়েও তোকে আমরা বেশি ভালোবাসি... শুনে আমার চোখে পানি এসে গেল বুঝলি? আমার জন্মদিনে এটাই আমার সেরা উপহার। হতভম্ব রতন তাকিয়ে দেখে মনি আপুর চোখ দুটো সত্যি সত্যি ছল ছল করছে ... কেন যেন তার চোখ দুটোও ভিজে উঠল।

মনি আপু হঠাৎ রতনকে জড়িয়ে ধরে ফিস ফিস করে বলল, ভাইয়া তোর সব আদরে আমি ভাগ বসিয়েছি তাই নারে?' রতন জোর গলায় বলতে চাইল, 'না কখনোই না...' বলতে পারল না তার গলাটাও কেমন যেন ধরে এসেছে।

(তবে এর মধ্যেও রতন একটু আগে তার নকল বাবা-মাকে লেখা চিঠিটা দলামোচড়া করে ছুলে দিল টেবিলের নিচের বিনটায়, মনি আপুর চোখ এড়িয়ে!)

এ যুগের জোলা-জুলি

আধুনিক যুগের দুই পরিবার। তবে ভয়ানক দুই বোকা পরিবার। বিশতলা অ্যাপার্টমেন্টের বিশতলায় থাকে এক পরিবার আর নিচতলায় থাকে আরেক পরিবার। প্রশ্ন হতে পারে বোকারা আবার ফ্ল্যাটের মালিক হয় কীভাবে? বোকারা তো থাকবে গ্রামেগঞ্জে! খেয়ে না খেয়ে থাকবে আর বোকামো করবে আর পাবলিক হাসাবে। না, আসলে যুগ বদলে গেছে এখন বোকা ধুরন্ধর চালাক ...সব শহরে চলে এসেছে... তারা আর গ্রামে... থাক গ্রামের প্রসঙ্গ। এটা শহরের গল্প যে !

যাহোক সেই দুই পরিবার। মানে বোকা পরিবার। কিন্তু পয়সাওয়ালা বোকা। তবে দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ আছে, রেষারেষিও আছে। তো একদিন হলো কি ঐ বিশতলা অ্যাপার্টমেন্টের লিফট নষ্ট হয়ে গেল। তখনই বিশতলার বোকা দম্পতির মাথায় বুদ্ধিটা এল। বউয়ের মাথায়ই এল বুদ্ধিটা কারণ 'লেডিস ফার্স্ট'। বউ বলল

ওগো তুমি এবার ওদের দাওয়াত দাও

আরে কী বলছ? লিফট নষ্ট না? ওরা আসবে কীভাবে?

আরে বোকা সেই জন্যই তো দাওয়াত দেবে। সিঁড়ি দিয়ে বিশতলায় হেঁটে এসে দেখবে হি হি বউ ব্যাপারটা চিন্তা করে হেসে ফেলে।

কী দেখবে? জামাই জানতে চায়।

আরে তুমি সত্যিই একটা গাধা বাকিটা কানে কানে বলে জামাইয়ের যদিও আশপাশে শুনে ফেলার মতো কেউ নেই। বউয়ের বুদ্ধি শুনে হো হো করে হেসে ফেলে জামাই 'ওহ দারুণ ডজ খাবে।' তখন তখনই সে নিচতলায় ফোন দেয়।

হ্যালো? ভাইজান ভালো আছেন?

আছি, কে বলছেন?

আরে কী জ্বালা। আমি বিশতলা থেকে বলছি... চিনতে পারছেন না?

ওহো, তা কী ব্যাপার?

আজ আপনাদের দাওয়াত ভাবিকে নিয়ে চলে আসুন বিশতলায় চারটে পোলাও ভাত খাবেন।

তাই? রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বউকে ফিস ফিস করে বলে 'বিশতলা থেকে পোলাও ভাতের দাওয়াত দিয়েছে কী বলব?'

তাই? হঠাৎ?? মানুষ ডাল-ভাতের দাওয়াত দিয়ে পোলাও খাওয়ায় আর ওরা পোলাও ভাতের দাওয়াত দিয়ে কী খাওয়াবে কে জানে। ঠিক আছে বলে দাও আমরা যাব। আজ রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। বরং উপর থেকে খেয়েই আসি।

হ্যাঁ, ঠিক আছে আমরা আসছি।

ধন্যবাদ।

দুপুরের দিকে সেজেগুজে নিচতলার বোকা দম্পতি লিফটের সামনে গিয়ে দেখে লিফটে কাজ চলছে আজ পুরো দিন লিফট বন্ধ থাকবে। হায় হায়। এখন কী হবে। তারা বুঝলই না লিফট নষ্ট থাকবে দেখেই

বিশতলার ওরা দাওয়াত দিয়েছে। কী আর করা দাওয়াত রক্ষা করতে তারা হাঁপাতে হাঁপাতে বিশতলায় গিয়ে হাজির হয়। কোন মতে দম নিয়ে বিশতলার দরজায় নক করতে যাবে দেখে সেখানে একটা নোটিশ ঝুলছে। 'হঠাৎ জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় বাইরে গেলাম। আজকের সব প্রোগ্রাম বাতিল। আমরা দুঃখিত'

হায় হায়! মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল নিচতলার জামাই।

এখন বুঝতে পেরেছি ওরা আমাদের ইচ্ছে করে বোকা বানিয়েছে। রাগে গজরাতে থাকে বউ। 'চলো নামি' তারা আবার সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকে। নামাটা অবশ্য অত কষ্টের না। 'এর প্রতিশোধ নিতে হবে' বউ ভেতরে ভেতরে গজরাতে থাকে।

নিচে এসে বউয়ের মাথায় বুদ্ধি খোলে। জামাইকে বলে

- শোনো তুমি এই কলমটা নিয়ে আবার বিশতলায় যাও
- কী বিশতলায় আবার যাব?? জামাই আর্তনাদ করে ওঠে। 'কেন??'
- না গেলে ওরা জিতে যাবে
-মানে? Banglapdf.net
- মানে বুঝলে না? বিশতলায় গিয়ে ওদের নোটিশ বোর্ডটার নিচে এই কলমটা দিয়ে লিখে আসবে 'লিফট নষ্ট তাই আমরা আসি নাই আজ' জামাই একটুক্ষণ চিন্তা করল তারপর হো হো করে হেসে উঠল 'ওহ সত্যি বউ তোমার এত বুদ্ধি...?? হা হা

জামাই কলম নিয়ে ছুটল আবার বিশতলায়।

হাঁপাতে হাঁপাতে বিশতলায় উঠে দেখে সেই নোটিশ বোর্ডটা তখনো ঝুলছে তার নিচে সে কলম দিয়ে লিখল-

' লিফট নষ্ট তাই আমরা আসি নাই আজ '

তারপর হাসতে হাসতে নিচে নামতে লাগল।

এদিকে বিশতলার ওরা দুপুরের পর দরজা খুলে নোটিশ বোর্ডটা দেখে হতভম্ব বউকে বলল

- দেখলে আমরা উল্টো ডজ খেলাম
- মানে?
- মানে এই দেখো। বউকে নোটিশ বোর্ডের নিচের লেখাটা দেখায় বউ হায় হায় করে ওঠে 'ধুৎ ওরা তাহলে আসেইনি! কী লাভ হলো তাদের ওদের দাওয়াত করে। মেজাজ খারাপ করে বউ গুম হয়ে বসে থাকল রান্না-বান্না মাথায় উঠল!
- কী হলো আজ কি আমরা খাব না?
- আজ কিছুই ভালো লাগছে না। চলো হোটেল থেকে খেয়ে আসি।
- বেশ, চলো।
তারা দুজন একটা রেস্টুরেন্টে গেল। আর কী আশ্চর্য পাশের টেবিলেই নিচের ওই দম্পতি।
- আরে আপনারা?
- আরে আপনারা??

আর বলেন না আপনারা দাওয়াত দিলেন ওদিকে লিফট বন্ধ তাই যেতে পারলাম না। ভাবলাম দাওয়াতের ভালো-মন্দ যখন খেতে পারলাম না চলো রেস্টুরেন্টে গিয়েই খাই।

আমরাও আপনাদের জন্য অপেক্ষা করতে করতে পার ভাবলাম খাবারগুলো ফ্রিজে থাক আরেক দিন লিফট ঠিক হলে আপনাদের দাওয়াত করা যাবে আজ বরং হোটেলে খাই...
- যাক ভালোই হলো দেখা হয়ে গেল।
- ঠিক ঠিক দেখা হয়ে গেল। আপনারা অর্ডার করেছেন?
- হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা করেছি।
- তাহলে আমরা অর্ডার করি... তবে এই সব হোটেলে আর কী খাব। প্যারিসে একবার আমরা একটা হোটেলে ছিলাম ওহ কী হোটেল ওখানে সুইমিংপুলে পর্যন্ত ওকে স্যুট-টাই পরে নামতে হতো...
বিশতলার দম্পতি ভাবল আরে, ও তো গল্প দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন বিশতলার বউ বলল 'ঠিকই বলেছেন ভাবি এ সমস্ত হোটেলে কী আর পাওয়া যায় আর কী বা খাব... আমরা সুইজারল্যান্ডে একবার

খাবারের অর্ডার দিলাম এত দুর্দান্ত সব খাবার যে শেষ পর্যন্ত দোভাষী দিয়ে খাওয়াতে হয়েছে!

এই সময় একটা লোক এল
- আপনারা কী চাচ্ছেন?
- মেন্যুটা দিন খাবারের অর্ডার দেব।
- মেন্যু?? আপনাদের মাথা খারাপ, না পেট খারাপ? এটা হোটেল-রেস্টুরেন্ট না, নিউরোলজিস্ট প্রফেসর আজমলের চেম্বার। আপনারা তার ওয়েটিং রুমে বসে আছেন। আপনাদের সিরিয়াল দুশো ছত্রিশ...

- এ্যাঁ??
এই 'এ্যাঁ!' বিশতলা আর নিচতলার চারজন এক সাথেই বলল!

এই গল্পের একটা মর‍্যাল আছে অবশ্য। মানে নীতি কথা আর কী! সেটা হচ্ছে–
বোকারা কখনো জিততে পারে না। চালাকরাই জেতে, তবে চালাকরা জেতে ফের বোকা হয়ে যায়... তারপর বোকামো শুরু করে....

সমান্তরাল
পৃথিবীর মানুষ

বাবা-মা দেশে বেড়াতে গেছে কদিনের জন্য। দিপু বাসায় একাই আছে। ভালোই ছিল। একা একা ইচ্ছেমতো সময় কাটছিল। রাত জেগে ডাউনলোড করা মুভি দেখলেও কেউ কিছু বলার নেই। কিন্তু হঠাৎ করে ভূতের উপদ্রব শুরু হলো। বিষয়টা এ রকম বাইরের প্যাসেজের ওপাশে কারা যেন রাত হলেই হাঁটাহাঁটি করে। কাঁচের জানালার ওপাশে সব ছায়ামানব। ভয়ে দিপুর কলজে উড়ে যাওয়ার অবস্থা। ব্যাপারটা তার বন্ধু সহিদকে বলল

- ধুৎ ভূত বলে কিছু নেই। সহিদের সাফ জবাব
- তাহলে ওরা কারা?
- ওরা সব সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষ
- মানে?
- মানে তোকে কীভাবে বোঝাই তুই তো আবার আর্টসের ছাত্র এগুলো তোর মাথায় ঢুকবে?

ভেতরে ভেতরে দিপুর রাগ উঠে যায়। এহ, আসছে সায়েন্স কপচাতে। দুই মার্কের জন্য সায়েন্স মিস করেছে সে। আর... যাহোক রাগ চেপে কোনোমতে বলে 'বল না দেখি মাথায় ঢুকে কি না।'

- শোন, এই মহাবিশ্বে শত শত সমান্তরাল পৃথিবী আছে মানে যাকে বলে প্যারালাল ওয়ার্ল্ড আর কী। এই পৃথিবীগুলো একটার ভেতরে আরেকটা ঢুকে গেছে। অনেকটা সুপার ইম্পোজের মতো।

- তারপর?

তারপর ঐ পৃথিবীর মানুষের সাথে আমাদের সরাসরি যোগাযোগ হয়তো হচ্ছে না। তার পরও আমরা মাঝে মাঝে ওদের দেখে ফেলি... বুঝলি কিছু?

- বুঝলাম। না বুঝেই মাথা নাড়ে দিপু। এগুলো সহিদ বানিয়ে বলছে কি না তারই বা সিওরিটি কী? 'তাহলে আমার কী করা উচিত?'

- তুই এক কাজ কর। সহিদ চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকায়।

- কী?

- তুই ওদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা কর।

- কীভাবে?

এরপর ওদের যখন দেখবি তখন বলবি, 'হে মহান সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষ আপনরা কি আমাকে কিছু বলতে চাইছেন?'

- মহান বলতে হবে কেন?

আরে বাবা, ওদের একটু হাওয়া না দিলে ওরা তোর সঙ্গে কথা বলবে মনে করিস? এই দুনিয়া চলছে হাওয়ার ওপর দ্য উইন্ড সবাইকে উইন্ডমিল হতে হবে বেঁচে থাকতে হলে।

- মানে?

- মানে এটাও সায়েন্স, তুই বুঝবি না... তুই তো আবার আর্টসের...

বহু কষ্টে রাগ সামলে দিপু বলে আমি ওদের প্রশ্ন করলে ওরা কি আমার কথা বুঝবে?

বুঝবে না মানে? ওরা নিশ্চয়ই আমাদের চেয়ে অনেক উন্নত। যেকোনো ভাষাই ওরা ধরতে পারবে।

- আচ্ছা... দেখি।

বলা যায় না, দেখি, আজ রাতে আমি চলেও আসতে পারি তোর বাসায়। তখন দুজনে মিলে বেশ...

- ওহ, তাহলে তো খুবই ভালো হয়, চলে আয়। দিপু এবার খুশি হয়।

সহিদ সত্যি সত্যি চলে এল দিপুর বাসায়। রাতে লাইট-টাইট অফ করে ওরা অপেক্ষা করতে লাগল সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষের জন্য। ঠিক তিনটার দিকে দেখা মিলল ছায়ামানবদের। জানালার ওপাশে প্যাসেজ ধরে কারা সব হাঁটাহাঁটি করছে।

- দেখেছিস?

- কী?

- সবার হাতে অদ্ভুত সব যন্ত্র?

আরে তাই তো। দিপু খেয়াল করল প্রতেক্যের হাতে কী সব জিনিসপত্র

- বুঝে গেছি।

- কী বুঝেছিস? ওরা অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছে।

- কেন?

আর কেন মনে হয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে। এখনই সময়।

- কিসের সময়?

আরে ওদের সঙ্গে যোগাযোগের। দাঁড়া আমি ওদের প্রশ্ন করি। সহিদ। গম্ভীর গলায় জোরে চেঁচিয়ে উঠল জানালার এপাশ থেকে 'হে মহান সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষ, আপনারা কি আমাদের কিছু বলতে চাইছেন?'

ছায়ামানবগুলো আগের মতোই হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। আবার চেঁচিয়ে উঠল সহিদ এবার আরো জোরে–

'হে মহান সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষ আপনাদের আমাদের পৃথিবীতে স্বাগত। আপনারা কি আমাদের কিছু বলতে চাইছেন?'

এবার মনে হলো ওরা কথা বুঝতে পেরেছে। অন্য পৃথিবীর ছায়ামানবরা থমকে দাঁড়াল। তারপর তাদের মধ্যে একটা হুড়াহুড়ি শুরু হলো। তারা এক এক করে সরে যেতে লাগল... একসময় দেখা গেল ছায়ামানবরা আর কেউ নেই।

- কী হলো?

- ওরা আমাদের কথা বুঝতে পেরেছে কিন্তু যোগাযোগ না করে চলে গেল কেন?

আরো কিছুক্ষণ তারা অপেক্ষা করল। তারপর সহিদ বলল, 'চল দরজা খুলে দেখি'

- দরজা খুলবি? আমার তো ভয় করছে।
- আরে কিসের ভয়? চল...
সাবধানে আস্তে করে ওরা প্যাসেজের দরজা খুলে বের হলো। অন্ধকার প্যাসেজ।
- প্যাসেজে কোনো লাইট নেই?
- আছে। দাঁড়া জ্বালাচ্ছি। দিপু লাইট জ্বালায়। প্যাসেজটা আলোকিত হয়ে ওঠে। প্যাসেজের অন্য প্রান্তে একটা স্টোর রুমের মতো। ওটার দরজা খোলা। তখনই আর্তনাদ করে ওঠে দিপু!
- সর্বনাশ
- কী হলো? সহিদ অবাক হয়ে তাকায় দিপুর দিকে।
- স্টোর রুম খোলা।
- তো?
দিপু ছুটে গেল স্টোর রুমের দিকে। সে আবার হায় হায় করে ওঠে।
- কী হলো?
- বুঝতে পারছিস না? স্টোর রুমের সব কিছু নিয়ে গেছে। স্টোর রুম ভর্তি ছিল বাবার ব্যবসার মালপত্র... পানির পাম্প, ভ্যাকুয়া ক্লিনার আরো কত কিছু, কিচ্ছু নেই।
- প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের মানুষরা এসব নিয়ে কী করবে?
- আরে ধুৎ তোর প্যারালাল ওয়ার্ল্ড ওরা চোর ছিল... তালা ভেঙে সব নিয়ে গেছে চোরেরদল... আর আমি তোর বুদ্ধিতে ভাবলাম...

এর পরের ইতিহাস করুণ। দিপুর বাবা-মা ফিরে এলে চোরাই মালের হিসাব করতে গিয়ে বের হলো। সমান্তরাল পৃথিবীর মানুষরা মানে চোরেরদল দিপুর বাবার স্টক করা প্রায় পাঁচ লাখ টাকার মালামাল নিয়ে গেছে টানা তিন দিন ধরে। বাবা অগ্নিদৃষ্টিতে তাকান পুত্রের দিকে

তুই কিছুই টের পেলি না?

পেয়েছিলাম

তো?

আমি ভেবেছি...কথা শেষ করতে পারে না দিপু , মিন মিন করে।

কী ভেবেছিলি ?

মানে... সহিদ বলল ওরা প্যারালাল ওয়ার্ল্ডের মানুষ।

বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন তাঁর বুদ্ধিমান পুত্রের মুখের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিড় বিড় করে বলেন। 'তোকেই প্যারালাল ওয়ার্ল্ডে পাঠাতে হবে। তুই আসলে এই পৃথিবীর জন্য ফিট না। '

তবে এই ঘটনার পর দিপুর একটা লাভ হয়েছে সহিদ কথায় কথায় আর বলে না ' তোকে কীভাবে বোঝাই তুই তো আবার আর্টসের ছাত্র এগুলো তোর মাথায় ঢুকবে?'

কাইযেন

জালাল সাহেব দেশে এসেছেন সপ্তাহ খানেকের জন্য। এসে শেরাটন হোটেলে উঠেছেন। যদিও তাঁর ছোটবোনের বাসা ধানমণ্ডিতে কিন্তু সেখানে উঠলেন না। তিনি একটা কনভেনশনে এসেছেন। কাইযেন কনভেশন। কাইযেন হচ্ছে একটা জাপানি দর্শন। সেটার ওপর এই কনভেনশন। তিনি বাংলাদেশি হলেও আমেরিকান সিটিজেন। দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকা আছেন ওখানেই সেটেল্ড। এই কনভেনশনের কারণে তাঁর আসা। তিনি এসেছেন খবর পেয়ে তাঁর বোন ফোন দিল

- ভাইয়া তুমি এসে শেরাটনে উঠেছ কেন?

- আমি তো একটা কনভেনশনে এসেছি দুদিনের জন্য ওরাই ব্যবস্থা করেছে। আমাকে একটা স্পিচ দিতে হবে।

না, আজই চলে আসো আমার বাসায় নতুন ফ্ল্যাট কিনেছি তুমি এখানে থাকবে। সুন্দর গেস্টরুম আছে।

- না রে সম্ভব না টাইট শিডিউল, এখানে থাকতে হবে।

- তাহলে অন্তত ডিনার করো একদিন, প্লিজ ভাইয়া... প্লিজ।

- না না রাতে সময়ই হবে না।

- তাহলে দুপুরে

- দেখি

- দেখি না, এখনই ফাইনাল করো। আজ দুপুরেই আসো। আমি গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি

- আচ্ছা পাঠাস।

ছোট বোন মনিকার ফ্ল্যাটটা সুন্দর। বেশ সুন্দর। লেকের পাশে বিশাল ফ্ল্যাটটা, বোনটা তাঁর ভালোই আছে বলতে হবে। জালাল সাহেব এর বেশ ভাল লাগে, বোনের স্বামী লোকটাও ভালো সরকারি বড় কর্মকতা।

খেতে বসে চমকালেন জালাল সাহেব, প্রচুর খাবার।

- এত কিছু করেছিস? তুই দেখছি পাগল একটা।

- বাহ, তুমি এত দিন পর এলে... আচ্ছা ভাইয়া ভাবিদের নিয়ে এলে না কেন?

- দুদিনের জন্য এসেছি কনভেনশনে তাই আর ঝামেলা করলাম না।

ছোট বোন খাবার প্লেটে তুলে দিচ্ছে।

- আহ, তুই তুলে দিচ্ছিস কেন আমি নিচ্ছি।

- না, আমি তুলে দিই তুমি তো কিছুই নিচ্ছ না। ওরা থাকলে কী মজা হতো। মনিকার দুই ছেলে তারা কক্সবাজার বেড়াতে গেছে মামাকে মিস করল। জালাল সাহেব ভগ্নিপতির সঙ্গে দেশ নিয়ে কথা বলেন। এ সময় মনিকা 'জমিলা জমিলা' বলে চেঁচিয়ে ডাকে।

একটা ছোট্ট মেয়ে আসে। জালাল সাহেব অবাক হয়ে দেখেন মেয়েটাকে। বাচ্চা মেয়েটার মিষ্টি চেহারা। তার বোনের বাসার কাজের মেয়ে?

- এই, তোর প্লেটটা নিয়ে আয়। মেয়েটি চলে গেল। ফিরে এল একটা প্লাস্টিকের প্লেট নিয়ে। জালাল সাহেব খেয়াল করলেন। মনিকা প্লাস্টিকের ছোট প্লেটটায় দু চামচ ভাত দিল আর তরকারির বাটি থেকে দিল দুটা আলু আর দিল ডাল। ব্যস এই?? তিনি খুব অবাক হলেন। টেবিলজুড়ে খাবার মুরগির রোস্ট, মাংসের তরকারি, মাছ ...কী নেই? আর এই মেয়েটির ভাগে ভাত-আলু, আর ডাল?

মেয়েটি থালাটা নিয়ে চলে গেল।

- মেয়েটা তোর বাসায় কাজ করে?

কাজ করে না ঘোরার ডিম করে, কিছু পারে না। তোমরা আছ আরামে ভাইয়া আমাদের এখানে ভালো কাজের লোকই পাওয়া যায় না। যা-ও একটা পেয়েছি কোনো কাজের না। ছুটা বুয়া আসে... খুব বিপদে আছি।

- আর ভাইজানদের ওখানে কি কাজের লোক আছে নাকি... তুমি তো তবু বুঝলেন ভাইজান। আমাদের দেশ যে উন্নত হচ্ছে এটা তার লক্ষণ কাজের লোক পাওয়া যায় না, সবাই এখন গার্মেন্টসে। হা হা

জালাল সাহেবের হঠাৎ করে খাবারের রুচি চলে যায়। তাঁর মাথায় ঘুরছে জমিলা নামের মিষ্টি মেয়েটার মুখ আর তার প্লেটের ভাত-ডাল আর আলুর প্লেটটা।

- ভাইয়া, তুমি তো কিছুই খাচ্ছ না।

- নাহ, রুচি হচ্ছে না। তিনি হঠাৎ উঠে পড়েন। 'তোরা খা আমি যাই ' বলে তিনি এক রকম তড়িঘড়ি করে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় অবশ্য দুশো ডলার রেখে যান তার দুই ভাগ্নের জন্য।

ফেরার সময় তিনি আর গাড়ি নেন না। একটা রিকশা নেন। জালাল সাহেবের মনটা খারাপ হয়ে যায়। রিকশাওয়ালা এক জায়গায় এসে থেমে পড়ে।

- কী হলো?

- স্যার, রিকশা আর যাইতে দিব না আপনি ডাইন দিক দিয়া ঘুইরা হাঁইটা যান গা।

- আচ্ছা। ভাড়া দিয়ে তিনি হাঁটেন। এ সমস্ত এলাকা তাঁর চেনা। বিশ বছর পর দেশে এসেছেন তাই একটু অন্য রকম লাগছে। জালাল সাহেবের চায়ের পিপাসা পেয়েছে। মনিকার বাসায় চা খাওয়া যেত কিন্তু ছোট্ট মেয়েটা তার জন্য চা বানাবে এটা চিন্তা করে আর বলেননি। তিনি একটু ছোট হোটেলে ঢুকে পড়েন।

-স্যার কী খাইবেন? একটা ছোট্ট ছেলে এসে বলে

- চা দাও
- খালি চা খাইবেন? শিঙ্গাড়া দিই?
- আচ্ছা দাও। শিঙ্গাড়া খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কিন্তু বাচ্চাটার আগ্রহে তিনি নিলেন। আহা, এত ছোট্ট বাচ্চা তার তো এ সময় স্কুলে যাওয়ার কথা সে রেস্টুরেন্টে কাজ করে।
ছেলেটা চা আর শিঙ্গাড়া দেয়।
- তোমার নাম কী?
- মজিদ।
এ সময় দোকানের ম্যানেজার ছেলেটার উদ্দেশে বলে ওঠে 'এই মজিদ্যা কাস্টমার নাই তুই এই চোডে খায়া ল। 'জে আইচ্ছা' বলে ছেলেটি দ্রুত একটি প্লেট নেয়। ছোট একটা প্লেট এটা সম্ভবত তার জন্য আলাদা প্লেট যেমনটা জমিলার জন্য ছিল আলাদা প্লেট। ভাত নেয় আর একটা ডিম নেয়। তারপর জালাল সাহেবের পাশের একটা টেবিলে বসে পড়ে এই সময় হঠাৎ ম্যানেজার খেকিয়ে ওঠে 'ঐ ছ্যামরা তোরে ডিম লইতে কইসে কেডা? শাক ল ডাইল ল।' জালাল সাহেব আশ্চর্য হয়ে দেখলেন ছেলেটি উঠে গিয়ে ডিমটা রেখে লালশাক নিল আর এক চামচ ডাল নিল। তারপর ফের এসে বসে তার পাশের টেবিলে আগ্রহ নিয়ে খাচ্ছে ছেলেটা। ছেলেটা খেতে খেতে জালাল সাহেবের দিকে তাকায় হেসে বলে 'আরেকটা শিঙ্গাড়া দিমু স্যার?'
জালাল সাহেব মাথা নাড়েন। তার শিঙ্গাড়া বা চা খাওয়ার ইচ্ছেটা মরে গেছে। যেমনটা হয়েছিল মনিকার বাসায়। তারপরও তিনি শিঙ্গাড়ায় কামড় দেন। এক চুমুক চা খান। প্রচুর মিষ্টি দেয়া বিস্বাদ চা। কিংবা কে জানে চাটা হয়তো ভালো তার বিস্বাদ লাগছে কোনো কারণে।

চা শেষ করে বিল দিয়ে বাইরে আসেন জালাল সাহেব। হাঁটা দেন তাঁর হোটেলের দিকে। এখান থেকে শেরাটন খুব দূরে নয়। এখন বাজে চারটা, পাঁচটায় কনভেনশন শুরু। কাইযেন কনভেশন।

কাইযেন এটা জাপানি দর্শন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এই দর্শন ব্যবহার করে জাপানিরা অনেক উন্নয়ন করেছে তাদের দেশে। এটা আসলে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের একটা মৌলিক বিষয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করে একটা বৃহৎ উন্নয়নে পৌঁছানোর কৌশল। বাংলাদেশের চৌষট্টিটা জেলায় নাকি এই কৌশল ব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে।

জালাল সাহেব তাঁর মাথা থেকে জমিলা আর মজিদের বিষয়টা সরিয়ে দিয়ে কাইযেন দর্শন নিয়ে ভাবার চেষ্টা করেন। যে বিষয়ে তাঁকে একটা বক্তব্য রাখতে হবে আজ। এই জন্যই এই কনভেনশনে তার আসা। কিন্তু দুটো বাচ্চার মুখ সরাতে পারেন না। দেশব্যাপী একটা বৃহৎ উন্নয়ন হয়তো এই দেশে একদিন হবে কিংবা হচ্ছে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক আগেই। এখন শুধু ধরে রাখার বিষয়। কিন্তু... তার পরও একটা কিন্তু থেকেই যায়। মানুষ হিসেবে আমাদের ভেতরের উন্নয়নটা কি আদৌ হচ্ছে? তাঁর বোন মনিকা, হোটেল ম্যানেজার... কিংবা তিনি নিজে? খুব কি পার্থক্য কিছু? তিনি আজ ভারী ভারী কিছু কথা বলে কিছু ডলার পকেটে ঢুকিয়ে কাল সকালের ফ্লাইটে আমেরিকায় চলে যাবেন তাঁর দুই ছেলে, এক মেয়ে আর স্ত্রীর কাছে। ওখানে তিনি ভালোই আছেন। ভালোই থাকবেন।

ওখানে জমিলা, মজিদ এরা নেই! কোনো মনোকষ্ট পাওয়ার ব্যাপারও নেই। এই তো জীবন!

পর্বত প্রতিবাদ

- কিরে সজল আজ স্কুল থেকে ফিরতে এত দেরি হলো যে?
- বাহ, আজ যে ভীষণ জ্যাম।
- মানে? জ্যাম তো প্রতিদিনই থাকে।
- না, আজ পাহাড়দের কারণে অনেক বেশি জ্যাম।
- পাহাড়দের কারণে মানে?
- কেন, জানো না আজ ঢাকা শহরে সব পাহাড়রা ঢুকে গেছে।
- পাহাড়? কোন পাহাড়, কী বলছিস?
- পাহাড় মানে পাহাড় মাউন্টেন হিল এইচ আই ডাবল এল
- ঢাকায় পাহাড় ঢুকেছে মানে কীসব বলছিস যাতা??!
- বিশ্বাস না হয় বাইরে গিয়েই দেখ... কম করে হলেও দশটা পাহাড় কাওরান বাজারের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য ভয়ানক জ্যাম আজ।

ক্লাস থ্রির ছাত্র সজলের কথা শুনে বাবা-মা দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ছেলেটার মাথা খারাপ হল নাকি?

আসলে এই বয়সে বাচ্চারা একটা কল্পনার জগতে থাকে। এটা ভালো। মা ফিস ফিস করে বলেন।

তা অবশ্য ঠিকই বলেছ। আইনস্টাইন স্বয়ং বলেছেন জ্ঞানের চেয়ে কল্পনাশক্তি জরুরি... বাবা তখন প্রশ্রয়ের ভঙ্গিতে সজলকে বললেন

তা বাবা পাহাড়দের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলে তুমি?

বলেছি।

বলেছ? বাবার চোখে-মুখে কৌতুক।

হ্যাঁ একটা বাচ্চা পাহাড়কে জিজ্ঞেস করলাম তোমরা তোমাদের জায়গা ছেড়ে শহরে কেন এলে?

তা সেই বাচ্চা পাহাড় তোমার কথা বুঝতে পারল?

হ্যাঁ পারল। ওরা বাংলা বোঝে আমাদের দেশের পাহাড় তো।

তা কী বলল, কেন তারা ঢাকা শহরে এসেছে?

তারা একটা প্রতিবাদ জানাতে এসেছে।

কিসের প্রতিবাদ?

ঐ যে আজকের সব খবরের কাগজে নাকি হেডিং এসেছে। 'দেশের মন্ত্রীদের পাহাড়সম সম্পদ'

বাবা-মা এবার দুজনেই নড়েচড়ে বসে সজলের দিকে তাকালেন। ছেলে এসব কী বলতে শুরু করেছে। ছেলে ফের বলল– 'তাইতেই তারা খেপেছে। মন্ত্রীদের সম্পদের সঙ্গে তাদের তুলনা?? সেটারই প্রতিবাদ জানাতে তারা আজ ঢাকার সব পত্রিকা অফিস ঘেরাও দিয়েছে। বিশ্বাস না হলে টিভি খুলে দেখো।' বাবা এবার সত্যি সত্যি টিভি খুললেন। আরে তাই তো ব্রেকিং নিউজ... ' ঢাকার পথে পথে পাহাড়দের পদচারণা... ব্যাপক ট্রাফিক জ্যাম... প্রধান পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে পাহাড়কুলের ফ্ল্যাগ মিটিং' হতভম্ব বাবা একের পর এক চ্যানেল বদলে দেখেন সব চ্যানেলে একই ব্রেকিং নিউজ... 'ঢাকার পথে পথে প্রতিবাদী পাহাড়কুলের ভিড়...

অবশেষে পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে ফলপ্রসূ সংলাপের পর পাহাড়কুল ফিরে গেল যার যার জায়গায়। সম্পাদককুল তাদের কথা দিয়েছেন আর কখনো মন্ত্রী- মিনিস্টারদের সম্পদের তুলনা দিতে গিয়ে পাহাড়কে তুলনা হিসেবে আনতে পারবেন না। নেভার এভার। কারণ তাদেরও একটা প্রেসটিজ জ্ঞান আছে। তবে একটা পত্রিকায় ছোট্ট একটা নিউজ বেরোল পরদিন। ' পর্বতের মূষিক প্রসব' খবরে

যা বর্ণনা করা হলো সেটা হচ্ছে একটি পর্বত নাকি ফিরে যাওয়ার পথে একটি মূষিক প্রসব করে গেছে ঢাকার রাজপথে। এটার কী কারণ এ নিয়ে এখন ঢাকার সব চ্যানেলে রীতিমতো টক শো হচ্ছে তবে সজলের বাবার ধারণা (তিনি সবগুলো টক শো মনোযোগ দিয়ে দেখছেন) পর্বতকুলের এই প্রতিবাদ কোনো কাজে আসবে না। আবারও পাঁচ বছর পর এমন একটা হেডিং আসবে খবরের কাগজগুলোতে। তাই এই ঘটনা পর্বতের মূষিক প্রসব ছাড়া আর কী... সেটাই কি তারা বুঝিয়ে গেল? কে জানে!